ইউনিট
৩

পৃথিবীর ভূমিরূপ
(Landforms of Earth)

ভূমিকা

পৃথিবী পৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, সমভূমি, মালভূমি ও মরুভূমিসহ বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়। কালের বিবর্তনে এসব ভূমিরূপ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও মনুষ্যজনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে। শুধু ভূ-পৃষ্ঠে এ রূপ দেখা যায় তা নয়, সমুদ্রের তলদেশেও স্থলভাগের মতো খুবই বৈচিত্র্যময়। এই ইউনিটে আমরা পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ যেমন- ভাঁজ ও চ্যুতি, সমভূমি, মালভূমি, পাহাড় ও পর্বত, মরুভূমি, বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবো। এছাড়া সমোন্নতি রেখার সাহায্যে কীভাবে বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন করা যায় তা শিখব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৩.১ : পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ
পাঠ ৩.২ : ভাঁজ ও চ্যুতি
পাঠ ৩.৩ : সমভূমি
পাঠ ৩.৪ : মালভূমি
পাঠ ৩.৫ : পাহাড় ও পর্বত
পাঠ ৩.৬ : মরুভূমি
পাঠ ৩.৭ : বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৩.৮ : ব্যবহারিক : সমোন্নিত রেখার সাহায্যে বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন

পাঠ-৩.১ পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ (Main Landforms of the Earth)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ

ভূ-পৃষ্ঠের গঠন সর্বত্র একরকম নয়। স্থলভাগের কোথাও সুউচ্চ পাহাড় ও পর্বত, কোথাও মালভূমি, কোথাওবা সুবিস্তৃত সমভূমি রয়েছে (চিত্র ৩.১.১)। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলে ভূমিরূপের পরিবর্তন হয়। ভূমিরূপের এই পরিবর্তন ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে এবং কখনো একাধিক পদ্ধতিতে সমন্বিতভাবে হয়েছে এবং পরিবর্তন ক্রিয়া চলছে দ্রুত, ধীরে ধীরে, আকস্মিকভাবে।

সাধারণভাবে বৃহত্তর ভূমিরূপ হতে পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রতর ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর ভূ-ভাগের শতকরা ৫৮ ভাগ এলাকা সমভূমি, ১৮ ভাগ পার্বত্যময় এবং অবশিষ্ট ২৪ ভাগ মালভূমি ও পাহাড় দ্বারা বিস্তৃত। ভূমিরূপের পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে ভূগোলবিদগণ সকল ভূমিরূপকে প্রধান তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যথা-

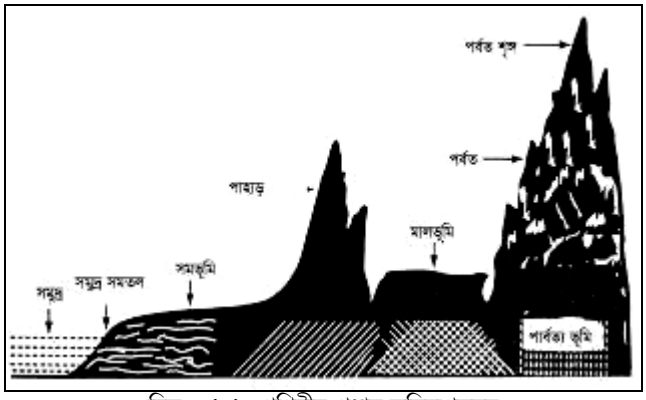

চিত্র ৩.১.১: পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ

ক) প্রথম পর্যায়ের ভূমিরূপ,
খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ এবং
গ) তৃতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ।

ক) প্রথম পর্যায়ের ভূমিরূপ : ভূ-ত্বক সৃষ্টির সর্বপ্রথম পর্যায়ে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলির সৃষ্টি হয়েছে। আদি উত্তপ্ত তরল পদার্থ পৃথিবীর উপরিভাগে শীতল হয়ে সংকুচিত হলে কোনো স্থান উঁচু আবার কোনো স্থান নিচু হয়। উপরের অংশগুলি নিয়ে মহাদেশীয় ভূ-ভাগ এবং নিচু অংশগুলো নিয়ে মহাসাগরীয় অঞ্চল গঠন করে। ভূ-ত্বক সৃষ্টির শুরুতেই এ প্রধান দুইটি ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় বলে এদেরকে প্রথম পর্যায়ের ভূমিরূপ বলা হয়। পৃথিবীর জলবায়ু তথা সার্বিকভাবে সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের জন্য মহাদেশ ও মহাসাগরের আকার, আয়তন এবং অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ : মহাদেশীয় ভূ-ভাগ ও মহাসাগরের তলদেশে পরবর্তী পর্যায়ে যে প্রধান ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়েছে তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ বলে। যেমন- পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, মহীসোপান, মহীঢাল, গভীর সমুদ্রের সমভূমি এবং গভীর সমুদ্রখাত। ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুরতা বলতে মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপকেই বুঝায়।

গ) তৃতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ : ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে ক্ষয় ও রূপান্তরের ফলে যে সকল ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাকে তৃতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ বলে। তৃতীয় পর্যায়ের যে সকল ভূমিরূপ রয়েছে সেগুলো ভূ-পৃষ্ঠে বৈচিত্র্য এনেছে। এইরূপ ভূমিরূপ বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টি হয়। যেমন- নদী, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রতরঙ্গ, ভূ-গর্ভস্থ জলধারা ও জৈবিক প্রক্রিয়া দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ অনবরত ক্ষয় সাধিত হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাগুলি অন্যত্র পরিবাহিত ও অবক্ষেপিত হয়। এভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উপত্যকা, গিরিখাত, সার্ক, ইয়ারডাং, সমুদ্রখাড়ি প্রভৃতি ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে অবক্ষেপিত হয়ে ব-দ্বীপ, প্লাবন সমভূমি, গ্রাবরেখা, ড্রামলিন, বালিয়াড়ি, চর, প্রবালদ্বীপসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপের চিত্রটি অনুশীলন করুন।

সারসংক্ষেপ

ভূ-পৃষ্ঠের গঠন সর্বত্র একরকম নয়। স্থলভাগের কোথাও সুউচ্চ পর্বত, কোথাও মালভূমি, কোথাও পাহাড়, কোথাওবা হাজার হাজার বর্গ কি.মি. বিস্তৃত সমভূমি রয়েছে। পৃথিবীর শতকরা ৫৮ ভাগ এলাকা সমভূমি, ১৮ ভাগ পার্বত্যময়, বাকি ২৪ ভাগ মালভূমি ও পাহাড় দ্বারা বিস্তৃত। স্থলভাগের ভূমিরূপের উদাহরণ হলো পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি এবং মহাসাগরগুলির তলদেশকে ভূমিরূপের উদাহরণ হলো মহীসোপান, মহীঢাল, গভীর সমুদ্রের সমভূমি ও গভীর সমুদ্রখাত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পৃথিবীর ভূমিরূপ প্রধানত কত প্রকার?

(ক) দুই (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। নিচের কোনটি দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ?

(ক) মহীসোপান (খ) ড্রামলিন

(গ) ব-দ্বীপ (ঘ) গিরিখাত

৩। পৃথিবীর শতকরা কত ভাগ এলাকা পার্বত্যময়?

(ক) ১৮% (খ) ২৪%

(গ) ৫৮% (ঘ) ৫০%

পাঠ-৩.২ ভাঁজ ও চ্যুতি (Fold and Fault)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাঁজ ও চ্যুতি কী তা জানতে পারবেন এবং
- ভাঁজ ও চ্যুতির প্রকারভেদ বলতে পারবেন।

ভাঁজ

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত। ফলে প্রতিনিয়ত তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে সঙ্কুচিত হচ্ছে। এতে বৃহত্তম ভূ-ত্বক ক্ষুদ্রতম অভ্যন্তরের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পেরে ফলের খোসার মতো কুঞ্চিত হয়ে যায়। এতে ভূ-ত্বকের নিচের অংশে চাপের পার্থক্য হয়ে ভূ-গর্ভে প্রবল আলোড়ন ঘটে। এ ভূ-আলোড়নের ফলে কোনো স্থান উপরে উঠে যায় আবার কোনো স্থান নিচু হয়ে আঁকাবাঁকা হয়। এরূপ আঁকাবাঁকা অংশকে ভাঁজ বলে। ভাঁজ এক ইঞ্চি থেকে কয়েক মাইল পর্যন্ত হতে পারে।

ভাঁজের প্রকারভেদ : আকৃতি ও অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ভাঁজ কয়েক প্রকার হতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ভাঁজ বর্ণনা করা হলো :

১. **খোলা বা সরল ভাঁজ (Open Fold) :** সঙ্কোচনের গতি যদি শুধুমাত্র একদিক থেকে চাপ দেয় তাহলে ভূ-ত্বক ভাঁজ হয়ে অতি সাধারণ চূড়া ও খাদের সৃষ্টি হয়। এর ফলে একটি অগ্রবর্তী কোণ ও অবনমিত ভূ–ভাগ সৃষ্টি হয়, একে খোলা বা সরল ভাঁজ বলে (চিত্র ৩.২.১)।

২. **সুষম বা প্রতিসম ভাঁজ (Systemetrical Fold) :** যে ভাঁজের দুই পার্শ্বস্থ বাহু সমান কোণে দুই দিকে হেলে থাকে, তাকে সুষম ভাঁজ বলে। একে প্রতিসম ভাঁজও বলা হয় (চিত্র : ৩.২.২)।

৩. **বিষম বা অপ্রতিসম ভাঁজ (Asymmetrical Fold) :** কোনো ভাঁজের এক পার্শ্বস্থ বাহু যদি অপর পার্শ্বস্থ বাহু অপেক্ষা অধিক খাড়া হয় তখন তাকে বিষম ভাঁজ বলে। এটি অপ্রতিসম ভাঁজ নামেও পরিচিত (চিত্র ৩.২.৩)। সুইজারল্যান্ডের জুরা পর্বতে এ ধরনের ভাঁজ দেখা যায়।

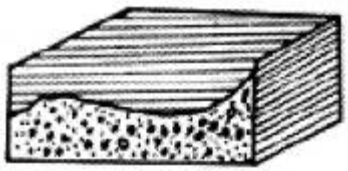

চিত্র ৩.২.১: খোলা ভাঁজ

চিত্র ৩.২.২: সুষম ভাঁজ

চিত্র ৩.২.৩: বিষম ভাঁজ

৪. **হেলান ভাঁজ (Isoclinal Fold) :** কোনো ভাঁজের চাপ অধিক হলে ভাঁজগুলো পরস্পর গায়ে গায়ে লেগে যায় এবং যে পার্শ্বে চাপের পরিমাণ কম সেদিকে ভাঁজগুলো হেলে যায়। এ ধরনের ভাঁজগুলোই হেলান ভাঁজ (চিত্র ৩.২.৪)।

৫. **শায়িত বা আনুভূমিক ভাঁজ (Recumbent Fold) :** একটি ভাঁজের উপর অন্য একটি ভাঁজ শায়িত বা আনুভূমিক অবস্থায় থাকলে তাকে শায়িত বা আনুভূমিক ভাঁজ বলে (চিত্র ৩.২.৫)। সাধারণত আনুভূমিক চাপ প্রবল হলে শিলাস্তর অধিক সংকুচিত হয়ে একটি ভাঁজের উপর আরেকটি ভাঁজ উঠে গিয়ে এ ধরনের ভাঁজ তৈরি করে।

৬. **সান্নিধ্য ভাঁজ (Closed Fold) :** অনেকগুলো ঊর্ধ্ব ভাঁজ যখন পাশাপাশি অবস্থান করে তখন তাকে সান্নিধ্য ভাঁজ বলে (চিত্র : ৩.২.৬)।

চিত্র ৩.২.৪: হেলান ভাঁজ

চিত্র ৩.২.৫: শায়িত বা আনুভূমিক ভাঁজ

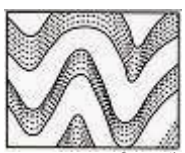

চিত্র ৩.২.৬: সান্নিধ্য ভাঁজ

৭. **উপভাঁজ (Fan Fold) :** যখন একটি বৃহত্তর ভাঁজের উপর অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতির ভাঁজ থাকে তখন তাকে উপভাঁজ বলে। আল্পস্ পর্বতে এ ধরনের উপভাঁজ রয়েছে।

৮. **উদ্‌ঘট্র ভাঁজ (Overthrust Fold) :** কোনো শায়িত ভাঁজের উপর আনুভূমিক চাপ অধিক হলে ঐ ভাঁজটির মধ্যভাগের শিলাসমূহ ফেটে গিয়ে একটি অংশ অপর অংশ থেকে বেশ কিছু দূরে স্থানান্তরিত হয়। এ ধরনের ভাঁজকে উদ্‌ঘট্ট ভাঁজ বলে।

৯. **পেরিক্লাইন ভাঁজ (Pericline Fold):** এ ভাঁজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির ভাঁজ। কোনো বড় ভাঁজ যদি তার আক্ষিক রেখা বরাবর কোনো কারণে নিচে অবনমিত হয়ে যে ভাঁজের সৃষ্টি হয় তাকে পেরিক্লাইন ভাঁজ বলে।

১০. **এন্টিক্লাইনোরিয়াম ও সিনক্লাইনোরিয়াম (Anticlinorium and Synclinorium) :** বড় আকারের উর্ধ্বভাঁজ ও অধঃভাঁজের উপরও কখনো কখনো ছোট ছোট ঊর্ধ্ব ও অধঃভাঁজ থাকতে পারে। ঊর্ধ্বভাঁজের উপর অবস্থিত এই ভাঁজকে এন্টিক্লাইনোরিয়াম এবং অধঃভাঁজের উপর অবস্থিত ভাঁজকে সিনক্লাইনোরিয়াম বলে।

চ্যুতি (Fault)

ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্ট ফাঁটলের একদিকের অংশ স্থানচ্যুত হয়ে ভূ-গর্ভে বসে যায় আবার কিছু অংশ উপরে উত্থিত হয়। এই ধরনের ভূমিরূপকে চ্যুতি বলে (চিত্র ৩.২.৭)। চ্যুতি যে কোনো প্রকার শিলাতে সৃষ্টি হতে পারে। তবে পাললিক শিলায় চ্যুতির পরিমাণ বেশি। চ্যুতির পরিমাণ কয়েক সেন্টিমিটার থেকে কয়েকশ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

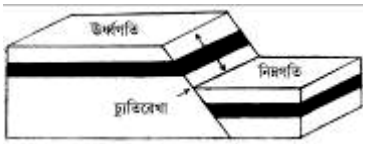

চিত্র ৩.২.৭: চ্যুতি (চ্যুতি রেখা বরাবর শিলা ঊর্ধ্ব বা নিম্নগতি

চ্যুতির কারণ

ভূ-পৃষ্ঠের যে কোনো স্থান আনুভূমিক সঙ্কোচন বা সম্প্রসারিত হলে চ্যুতির সৃষ্টি হতে পারে। আবার কোনো শিলাস্তরে অধিক সঙ্কোচনের প্রভাব পড়লে অপ্রতিসম্য ভাঁজ বা আনুভূমিক ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে শেষ পর্যন্ত ফাটল ও চ্যুতির সৃষ্টি হতে পারে। এইভাবে একেকটি ভাঁজ একেকটি চ্যুতিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রত্যেক চ্যুতির দুইটি করে পার্শ্ব থাকে। যথা– উত্থিত পার্শ্ব এবং অবনত পার্শ্ব। যে সমতল হতে চ্যুতির পার্শ্ব উত্থিত বা অবনত হয় অর্থাৎ চ্যুতির সৃষ্টি হয় তাকে চ্যুতিতল (Fault Plane) বলে। চ্যুতিতল সাধারণত ঢালু হয় তবে তা খাড়াও হতে পারে। চ্যুতির উত্থিত পার্শ্বের ঢালকে চ্যুতিঢাল (Fault Scarp) বলে। উত্থিত পার্শ্বের উপরের নরম শিলাস্তর ক্ষয়সাধনের ফলে অপসারিত হলে নিম্নের কঠিন শিলা দৃষ্টিগোচর হয় এবং চ্যুতিঢালের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। একে চ্যুতিরেখা ঢাল (Fault Line Scarp) বলে।

চ্যুতির শ্রেণিবিভাগ (Type of Faults) : গঠন, আকৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার চ্যুতি রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু চ্যুতির বর্ণনা দেয়া হলো–

১. **স্বাভাবিক চ্যুতি (Normal Fault) :** কোনো চ্যুতির নিম্ন দেয়াল উপরে উত্থিত হলে বা ঝুলন্ত দেয়ালের নিম্নে অবতরণ করলে তাকে স্বাভাবিক চ্যুতি বলে। স্বাভাবিক চ্যুতির চ্যুতিতল অবনত পার্শ্বেও ঢালু থাকে (চিত্র ৩.২.৮)।

২. **বিপরীত চ্যুতি (Reverse Fault) :** বিপরীত চ্যুতি স্বাভাবিক চ্যুতির ঠিক উল্টো। কারণ এর ক্ষেত্রে ঝুলন্ত দেয়াল উপরে উত্থিত হয় এবং নিম্ন দেয়াল নিম্নে অবতরণ করে। ঝুলন্ত দেয়াল অবনত পার্শ্বের উপর বেশি হেলে থাকে বলে তাকে বিপরীত চ্যুতি বলে (চিত্র ৩.২.৯)।

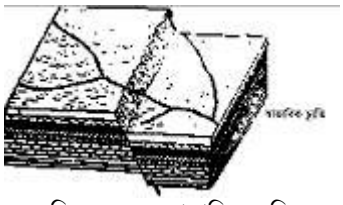
চিত্র ৩.২.৮: স্বাভাবিক চ্যুতি

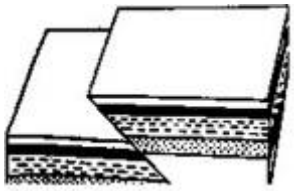
চিত্র ৩.২.৯: বিপরীত চ্যুতি

৩. **শাখায়িত চ্যুতি (Branching Fault) :** একটি প্রধান চ্যুতিকে কেন্দ্র করে দুই বা ততোধিত অপ্রধান চ্যুতির সৃষ্টি হলে তাকে শাখায়িত চ্যুতি বলে।

৪. **ধাপ চ্যুতি (Step Fault) :** একই চ্যুতিতলে অবনত পার্শ্বে এর সমান্তরালে পরপর কয়েকটি চ্যুতির সৃষ্টি হলে তাতে ধাপ বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতির উদ্ভব হয়। এই চ্যুতি সমষ্টিকে ধাপচ্যুতি বলে(চিত্র ৩.২.১০)।

৫. **স্ট্রাইক চ্যুতি (Strike Fault) :** যে চ্যুতি কোনো ঢালুর স্ট্রাইকের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে তাকে স্ট্রাইক চ্যুতি বলে।

চিত্র ৩.২.১০: ধাপ চ্যুতি

৬. **ডিপ চ্যুতি (Deep Faults) :** অবস্থানের দিক থেকে ডিপ চ্যুতি স্ট্রাইক চ্যুতির বিপরীত। ডিপ চ্যুতি স্ট্রাইকের সাথে সমকোণে অবস্থান করে। কাজেই স্ট্রাইকের অবস্থানের উপর এর অবস্থান নির্ভর করে।

৭. **তির্যক চ্যুতি :** একই সাথে উল্লম্ব ও আনুভূমিকভাবে ভূমি স্থানান্তরিত হলে যে চ্যুতির সৃষ্টি হয়, তাকে তির্যক চ্যুতি বলে। এ চ্যুতি একই সাথে ডিপ ও স্ট্রাইককে ছেদ করে।

৮. **কবজা চ্যুতি :** ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে কোনো ভূ-খন্ড স্ট্রাইক বরাবর একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত উপরে উত্থিত হয়ে আবার নিম্নে অবনমিত হয়ে থেকে গেলে কবজা চ্যুতি বলে।

৯. স্রস্ত **উপত্যকা** : দুইটি স্বাভাবিক চ্যুতির মাঝখানে কোনো ভূ-ভাগ অবনমিত হয়ে যে নিম্নভূমির সৃষ্টি করে তাকে স্রস্ত উপত্যকা বলে (চিত্র ৩.২.১১)। স্রস্তউপত্যকার উভয় দিকের চ্যুতিতল দেয়ালের মত দেখায়। এর অপর নাম গ্রাবন। জার্মানীর রাইন উপত্যকা, ইসরাইলের মরুসাগর প্রভৃতি স্রস্ত উপত্যকার উদাহরণ।

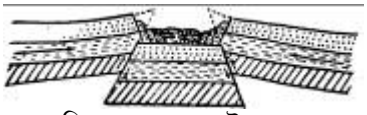
চিত্র ৩.২.১১: স্রস্ত উপত্যকা

১০. স্রস্ত **মালভূমি** : স্রস্ত উপত্যকার বিপরীত ভূ-প্রকৃতি স্রস্ত মালভূমি। কমপক্ষে দুইদিকে চ্যুতিতল বিশিষ্ট কোন ভূ-খন্ড উপরে উত্থিত হলে তাকে স্রস্ত মালভূমি বলে (চিত্র ৩.২.১২)।

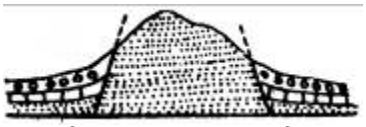
চিত্র ৩.২.১২: স্রস্ত মালভূমি

শিক্ষার্থীর কাজ	ভাঁজ ও চ্যুতি কীভাবে সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

শিলাস্তরের আনুভূমিক সংকোচনের ফলে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। কোনো কারণে ভূ-পৃষ্ঠে আনুভূমিক চাপ পড়লে পাললিক শিলাস্তর অতি সহজেই প্রভাবিত হয়। উভয় দিক থেকে অথবা যে কোনো একদিক থেকে পার্শ্বচাপ পড়লে সম্মুখের শিলাস্তর আঁকাবাঁকা ভঙ্গিল আকার ধারণ করে। এইরূপ আনুভূমিক চাপের ফলে শিলাস্তরের বিভিন্ন স্থানে উঁচু-নিচু হয়ে যায়, এই উঁচু-নিচু অবস্থাকে ভাঁজ বলে। বিভিন্ন প্রকার ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো কোনো ফাটল বরাবর অথবা ফাটল হতে একটি শিলাস্তরের তুলনায় অন্য শিলাস্তরের স্থান চ্যুতি হলে তাকে চ্যুতি বলে। চাপই মূলত ভাঁজ ও চ্যুতির কারণ। ভাঁজ ও চ্যুতি বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শিলাস্তরের আনুভূমিক সংকোচনের ফলে সৃষ্টি হয়–
i. ভাঁজের ii. চ্যুতির iii. মালভূমি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। দুইটি স্বাভাবিক চ্যুতির মাঝখানে কোনো ভূ-ভাগ অবনমিত হয়ে যে নিম্ন ভূমির সৃষ্টি করে তাকে কী বলে?
(ক) স্রস্ত মালভূমি (খ) স্রস্ত উপত্যকা (গ) ভ্রষ্ট উপত্যকা (ঘ) কোনটিই নয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
জনৈক ভূগোলবিদ পৃথিবী পরিভ্রমনে বের হয়ে বিভিন্ন প্রকার ভাঁজ ও চ্যুতি লক্ষ্য করলেন। ফিরে আসার পর তিনি তার শিক্ষার্থীদেরকে ভাঁজ ও চ্যুতি সম্পর্কে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন।

৩। যখন সকল ভাঁজের অবনমন উভয় দিকে সমভাবে ঢালু হয়, তাকে কী ধরনের ভাঁজ বলে?
(ক) সমকাত ভাঁজ (খ) প্রতিসম ভাঁজ (গ) আনুভূমিক ভাঁজ (ঘ) কোনটিই নয়

৪। একই চ্যুতিতলে অবনত পার্শ্বে এর সমান্তরালে কয়েকটি চ্যুতির সৃষ্টি হলে, তাকে কী ধরনের চ্যুতি বলে?
(ক) ধাপ চ্যুতি (খ) স্ট্রাইক চ্যুতি (গ) ডিক চ্যুতি (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৩.৩ সমভূমি (Plain)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সমভূমির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন প্রকার সমভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।

সমভূমি

সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় সম উচ্চতায় সুবিস্তৃত স্থলভাগকে সমভূমি বলা হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকশ মিটার উঁচুতেও সমভূমি গঠিত হতে পারে। সমভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েকশত ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় অবস্থিত হতে পারে। সমভূমিতে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট ভূমি, ছোট ছোট টিলা, পাহাড় এবং নদী উপত্যকার উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় অর্ধেক সমভূমি। মানুষের আবাস এবং অর্থনৈতিক কামকান্ড সমভূমিতে সংঘটিত হয়। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশে সমভূমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি আফ্রিকা মহাদেশে সমভূমির পরিমাণ সবচেয়ে কম। ইউরেশিয়ার উত্তরাংশ জুড়ে পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমি অবস্থিত। ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে সমভূমিগুলো যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ।

সমভূমির বৈশিষ্ট্য

সমভূমিতে সাধারণত কোনো উচ্চভূমি, নিম্নভূমি বা খাড়া ঢাল থাকে না। তবে সামান্য উঁচু-নিচু বা বন্ধুর হতে পারে। সমভূমিসমূহ সাধারণত মহাদেশের সীমান্তে, মহাসাগরের তীরে অথবা মহাদেশীয় ভূ-ভাগের অভ্যন্তরে হতে পারে।

সমভূমির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Plains) : অবস্থান ও গঠনপ্রণালির ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর সমভূমিকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১) ক্ষয়জাত সমভূমি : বহু উচ্চভূমি দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- বায়ুপ্রবাহ, সৌরতাপ, বৃষ্টিপাত, পানিস্রোত, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা ক্ষয় হয়ে ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে পরিণত হয়। এ জাতীয় সমভূমিকে ক্ষয়জাত সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৩.১)। ইউরোপের ফিনল্যান্ড ও উত্তর আমেরিকার হাডসন উপসাগর তীরবর্তী সমভূমি ক্ষয়জাত সমভূমির উদাহরণ।

২) হৈমবাহিক সমভূমি : উচ্চ পর্বতগাত্র হতে বরফের প্রবাহ বা হিমবাহ নিচের দিকে নেমে আসার সময় প্রবল ঘর্ষণে ভূমি ক্ষয় হয়ে সমভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আবার হিমবাহের সাথে যে সকল শিলা, কাঁকর ও নানাবিধ প্রস্তরখন্ড নিচে নেমে আসে সেগুলো সঞ্চিত হতে হতে অসমান ভূমিকে সমভূমিতে পরিণত করে। এভাবে হিমবাহের মাধ্যমে এ জাতীয় সমভূমি সৃষ্টি হয় বলে একে হৈমবাহিক সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৩.২)। এ জাতীয় সুবিস্তৃত সমভূমি উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ, ফিনল্যান্ড, পূর্ব কানাডা এবং সুইডেনে দেখা যায়।

চিত্র ৩.৩.১: ক্ষয়জাত সমভূমি

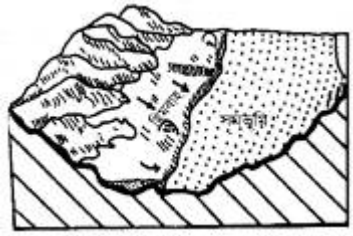
চিত্র ৩.৩.২: হৈমবাহিক সমভূমি

৩) কার্স্ট সমভূমি : চুনাপাথরের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ জলধারার মাধ্যমে সৃষ্ট সমভূমিকে কার্স্ট সমভূমি বলে। যুগোশ্লোভিয়ার কার্স্ট অঞ্চলে এ জাতীয় সমভূমি দেখা যায়। এ কার্স্ট অঞ্চলটি আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব তীরের সাথে

সমান্তরালভাবে প্রায় ৮০ কি. মি. দীর্ঘ এলাকা জুড়ে অবস্থিত। ভূ-গর্ভস্থ জলধারা দ্বারা খড়িমাটি বা চুনাপাথর দ্রবীভূত হয়ে কার্স্ট সমভূমি সৃষ্টি হয়।

৪) সঞ্চয়জাত সমভূমি : বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- নদী, বায়ুপ্রবাহ ও হিমবাহের মাধ্যমে উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পলিমাটি, কাঁকর, বালু, কর্দম প্রভৃতি নিম্নস্থানে সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে সঞ্চয়জাত সমভূমি বলে। এ জাতীয় সমভূমি যে কোনো ভূমির তুলনায় অধিক উর্বরতাসম্পন্ন। অবস্থান ও গঠনপ্রণালির উপর ভিত্তি করে সঞ্চয়জাত সমভূমিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

৪.১. লাভা সমভূমি : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত গলিত লাভা দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের যে সমভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে লাভা সমভূমি বলে। দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের কৃষ্ণ মৃত্তিকাময় সমভূমিটি লাভা সমভূমির উদাহরণ।

৪.২. পলিজ সমভূমি : নদীবাহিত কাঁকর, বালি, পলি প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি সৃষ্টি হয় তাকে পলিজ সমভূমি বলে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্তীর্ণ সমভূমিগুলো এভাবে গঠিত হয়েছে। যেমন- মিসিসিপি অববাহিকা, নীল নদের অববাহিকা, গঙ্গা অববাহিকা, হোয়াংহো অববাহিকা প্রভৃতি সমভূমি দীর্ঘদিন যাবৎ পলি সঞ্চিত হয়ে গঠিত হয়েছে। এ জাতীয় সমভূমি কৃষিকাজের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। পলিজ সমভূমিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

৪.২.১. পাদদেশীয় সমভূমি : পাহাড়ী নদী দ্বারা পর্বতের ঢাল হতে ক্ষয়প্রাপ্ত নানা আকৃতির প্রস্তর ও শিলাখন্ড, কাঁকর, নুড়ি ও বালুকণা প্রভৃতি পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়। এভাবে নদী দ্বারা অবক্ষেপণের ফলে পর্বতের পাদদেশে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৩.৩)। যেমন- বাংলাদেশের দিনাজপুর এবং রংপুর জেলার অধিকাংশই পাদদেশীয় সমভূমি।

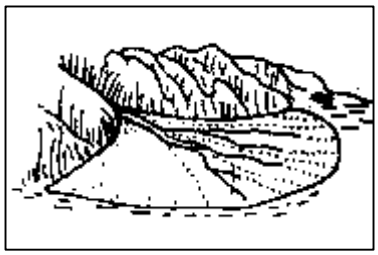

চিত্র ৩.৩.৩: পাদদেশীয় সমভূমি

৪.২.২. প্লাবন সমভূমি : নদীর পরিণত অবস্থাতে বন্যার সময় পানি স্রোতের সাথে বালি, কাঁকর প্রভৃতি এর গতিপথের দু'দিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে জমা হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে প্লাবন সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৩.৪)।

৪.২.৩. ব-দ্বীপ : নদীর গতিপথের সর্বশেষ পর্যায়ে অর্থাৎ সমুদ্রে পতিত হওয়ার পূর্বে নদীর গতি সর্বাধিক মন্থর থাকে এবং পানিতে পলির পরিমাণ থাকে সর্বাধিক। ফলে নদীর মোহনাতে প্রচুর পরিমাণে পলি সঞ্চিত হয়। এ পলি সঞ্চিত হতে হতে বাংলা মাত্রাহীন 'ব' এর মতো যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে ব-দ্বীপ বলে (চিত্র ৩.৩.৫)। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, পাকিস্তানের সিন্ধু, মিশরের নীল, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী, চীনের ইয়াংসি, হোয়াংহো, উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি, ইতালির পো প্রভৃতি নদীর মোহনায় বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ গঠিত হয়েছে।

৪.৩ . লোয়েস সমভূমি : বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে ধূলিকণা, বালুকা, মাটি প্রভৃতি একস্থান থেকে অন্যস্থানে সঞ্চিত হয়। ভূমির ক্ষয় ও গঠনের জন্য বায়ুপ্রবাহ শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চলে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এ বায়ুর দ্বারা দীর্ঘদিনের সঞ্চয়ক্রিয়ার ফলে ধীরে ধীরে যে সমভূমি গঠিত হয় তাকে লোয়েস সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৩.৬)। চীনের পূর্বদিকে হোয়াংহো নদীর উপত্যকায় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত গোবি মরুভূমির বালুরাশি সঞ্চিত হয়ে লোয়েস সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্র ৩.৩.৪: প্লাবন সমভূমি

চিত্র ৩.৩.৫: ব-দ্বীপ সমভূমি

৪.৪. উপকূলীয় সমভূমি : ভূ-আন্দোলনের ফলে মহীসোপান বা মহীঢাল অঞ্চলে অর্থাৎ সমুদ্র তীরের মহাদেশগুলোর প্রান্তভাগে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে উপকূলীয় সমভূমি বলা হয় (চিত্র ৩.৩.৭)। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের উপকূলে সরু অথচ সুদীর্ঘ উপকূলীয় সমভূমির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

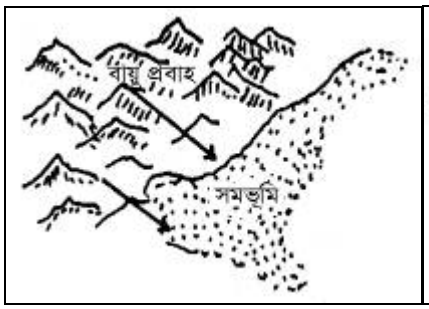

চিত্র ৩.৩.৬: বায়ুতাড়িত লোয়েস সমভূমি

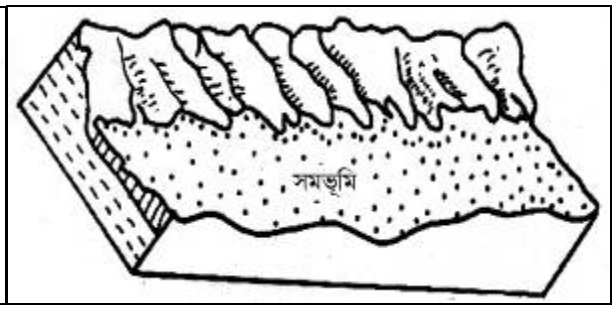

চিত্র ৩.৩.৭: উপকূলীয় সমভূমি

শিক্ষার্থীর কাজ	সমভূমির শ্রেণিবিভাগ ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় সম উচ্চতায় সুবিস্তৃত ভূ-ভাগকে সমভূমি বলে। সমুদ্র সমতল থেকে সমভূমির উচ্চতা খুব বেশি হয় না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে কয়েকশ ফুট উঁচুতে গঠিত হতে পারে। সমভূমি যে সবসময় একেবারে সমতল হবে তা নয়। মৃদু ঢাল, ছোট ছোট টিলা বা খুব নিচু পাহাড় এবং নদী উপত্যকার সমন্বয়ে সমভূমি গঠিত হতে পারে। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় অর্ধেক হলো সমভূমি। অধিকাংশ মানুষ এ সমভূমিতে বসবাস করে। সমভূমি বিভিন্নভাবে গঠিত হতে পারে। এর মধ্যে সঞ্চয়জাত ও ক্ষয়জাত সমভূমি অন্যতম। সঞ্চয়জাত সমভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ লাভা সমভূমি, পলিজ সমভূমি, পাদদেশীয় সমভূমি, প্লাবন সমভূমি ও ব-দ্বীপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ স্থলভাগের কোন অংশে বসবাস করে?

(ক) মালভূমি (খ) সমভূমি (গ) মরুভূমি (ঘ) কোনটিই নয়

২। ব-দ্বীপ কোন ধরনের সমভূমি?

(ক) সঞ্চয়জাত (খ) কার্স্ট (গ) ক্ষয়জাত (ঘ) হিমবাহ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ প্রশ্নের উত্তর দিন।

মানুষ সমতলভূমিতে বসবাস করে। কারণ মানুষের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপযোগী ভূমি সমভূমি। তাই সমভূমি মানব সভ্যতার জন্য অপরিহার্য।

৩। সমুদ্রের তীরে মহাদেশগুলোর প্রান্তভাগে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে কী ধরনের সমভূমি বলা হয়?

(ক) উপকূলীয় (খ) সামুদ্রিক (গ) হিমবাহ (ঘ) হ্রদ

৪। নদীর মোহনাতে প্রচুর পরিমাণে পলি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে কী ধরনের সমভূমি বলা হয়?

(ক) উপকূলীয় (খ) সামুদ্রিক (গ) হিমবাহ (ঘ) ব-দ্বীপ

পাঠ-৩.৪ মালভূমি (Plateau)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মালভূমির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন প্রকার মালভূমি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মালভূমি

সমুদ্র সমতল হতে অপেক্ষাকৃত উচ্চে অবস্থিত খাড়া ঢালযুক্ত অসমতল এবং প্রশস্ত ভূমিভাগকে মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.১)। তিব্বতের পামির মালভূমি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। মালভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে কয়েকশ মিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভূ-অভ্যন্তরস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার কারণে মালভূমি সৃষ্টি হতে পারে। পৃথিবীর মোট ভূমির শতকরা পাঁচভাগ মালভূমি।

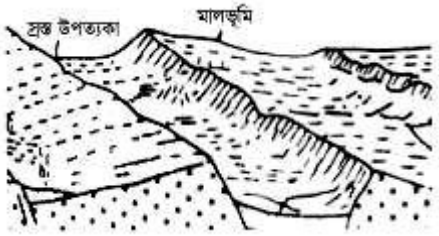

চিত্র ৩.৪.১: মালভূমি

মালভূমির বৈশিষ্ট্য : মালভূমির প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা-

ক) এটি বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি,

খ) এর উপরিভাগ তরঙ্গায়িত ও অসমতল এবং

গ) এটি চারদিক থেকে নিম্নভূমিতে নেমে যায়।

মালভূমি সৃষ্টির কারণ : ভূ-অভ্যন্তরস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনটি প্রধান কারণ মালভূমি সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যথা-

১) ভূ-আন্দোলন ও পাত-সঞ্চালন। উদাহরণ- তিব্বতের পামীর মালভূমি।

২) ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন। উদাহরণ- সাইবেরিয়ার পূর্ব মালভূমি।

৩) ভূ-পৃষ্ঠে লাভা সঞ্চয়। উদাহরণ- ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি।

মালভূমির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Plateaus): উৎপত্তির ভিত্তিতে মালভূমিকে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নের ছকে তা দেখানো হলো-

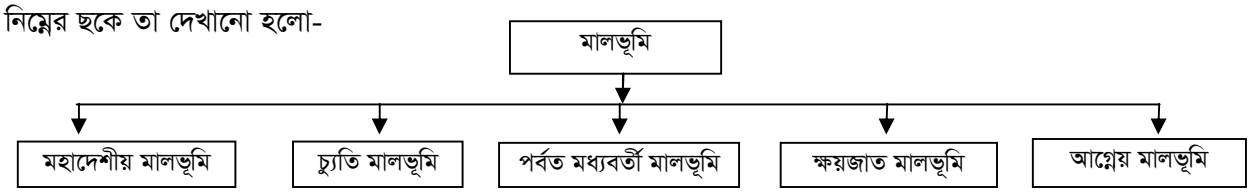

১. মহাদেশীয় মালভূমি : মহাদেশীয় প্রাচীন শিলাস্তূপ নগ্নীভবনের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিস্তৃত এলাকাব্যাপী যে ভূমি সৃষ্টি হয় তাকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.২)। এ ধরনের মালভূমিসমূহ উচ্চতা সাধারণত সমুদ্র সমতল থেকে ৫০-১০০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং কেলাসিত হয়। উদাহরণ : কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার শিল্ড।

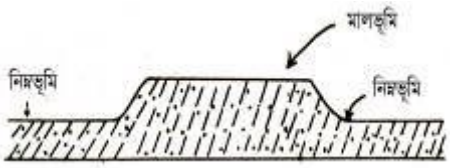

চিত্র ৩.৪.২: মহাদেশীয় মালভূমি

২. চ্যুতি মালভূমি : ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠে কোনো বিস্তৃত স্থান চ্যুতির সৃষ্টি হয়ে কোনো এলাকার বিরাট অংশ অসমানভাবে উপরে উঠে গিয়ে যে ভূমির সৃষ্টি করে তাকে চ্যুতি মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.৩)। মূলত ভূ-আন্দোলনজনিত এবং পাত সঞ্চালনজনিত কারণে এই ধরনের মালভূমি সৃষ্টি হয় যা চ্যুতি সৃষ্টির কারণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন- স্পেনের মেসেটা।

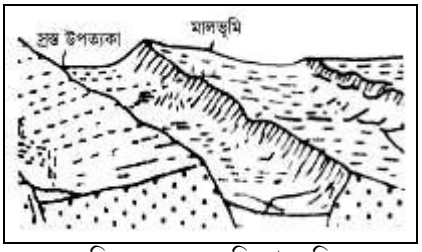

চিত্র ৩.৪.৩ : চ্যুতি মালভূমি

৩. পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি : সংকোচনজনিত চাপের কারণে ভঙ্গিল পর্বতের মাঝে এ ধরনের মালভূমি সৃষ্টি হয়। যেহেতু ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হওয়ার সময় পবর্তদ্বারা বেষ্টিত নিম্নস্থানসমূহ উঁচু হয়ে এই মালভূমি সৃষ্টি করে সেহেতু এ ধরনের মালভূমিকে পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.৪)। এ ধরনের মালভূমির উচ্চতা সাধারণত ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন- তিব্বতের মালভূমি।

৪. ক্ষয়জাত মালভূমি : কোনো পার্বত্য অঞ্চল বা উঁচু ভূ-খন্ড নদী, হিমবাহ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভূমির উচ্চতা হ্রাস পেয়ে প্রায় সমতল ভূমিতে পরিণত হলে তাকে ক্ষয়জাত মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.৫)। মূলত এই মালভূমি পুরাতন উঁচু ভূ-ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টির ফলে শিলার প্রকৃতি এর বন্ধুরতা নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইউরোপের ক্যালিডোনিয়ান পর্বতশ্রেণি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ফিজেল্ড মালভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

৫. আগ্নেয় মালভূমি : অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূ-ত্বকের কোনো ফাটল বা আগ্নেয়গিরির ছিদ্র পথে ভূ-গর্ভ হতে লাভা প্রবাহ ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং শীতলীকরণ প্রক্রিয়ায় ঠান্ডা হয়ে কঠিন অবস্থা ধারণ করে যে ভূমির সৃষ্টি হয় তাকে আগ্নেয়জাত মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.৬)। যেমন- ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি।

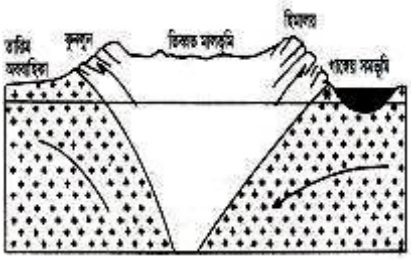
চিত্র ৩.৪.৪ : পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি

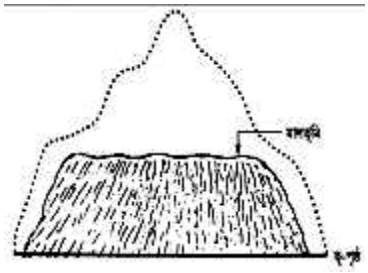
চিত্র ৩.৪.৫ : ক্ষয়জাত মালভূমি

চিত্র ৩.৪.৬ : আগ্নেয় মালভূমি

শিক্ষার্থীর কাজ	উদাহরণসহ মালভূমির শ্রেণিবিভাগ করুন।

সারসংক্ষেপ

সমুদ্র সমতল থেকে উঁচু বিস্তীর্ণ সমভূমিই মালভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা কয়েকশ মিটার হতে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু এর উপরিভাগ প্রায় সমতল। ভূ-অভ্যন্তরস্থ এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ উভয় প্রক্রিয়ার ফলেই মালভূমির সৃষ্টি হয়। উৎপত্তিগত দিক দিয়ে মহাদেশীয় শিল্ডস, চ্যুতি, পর্বত মধ্যবর্তী, ক্ষয়জাত ও আগ্নেয় মালভূমি এই পাঁচ ভাগে মালভূমিকে ভাগ করা। মালভূমি পৃথিবীর অভ্যন্তরের ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট এক প্রকার ভূমিরূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পৃথিবীর মোট ভূমির শতকরা কত অংশ মালভূমি ?

(ক) ১০% (খ) ১৩% (গ) ৫% (ঘ) ১৮%

২। ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি কী ধরনের মালভূমি?

(ক) লাভা গঠিত (খ) সমভূমি উন্নীত গঠিত (গ) সমপ্রায় ভূমি উন্নীত (ঘ) সমভূমি গঠিত

৩। পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমির উচ্চতা কত পর্যন্ত হতে পারে?

(ক) ৩-৫ হাজার মিটার (খ) ১৩-১৫ হাজার মিটার

(গ) ৬-৮ হাজার মিটার (ঘ) ২৩-২৫ হাজার মিটার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ প্রশ্নের উত্তর দিন।

মুহিন ও তার বন্ধুরা পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষা সফরে গেলেন। তারা সুউচ্চ পাহাড় ও পর্বত দেখলেন। তারা নতুন এক ধরনের ভূমিরূপ দেখলেন যা সম্পর্কে তাদের আগে কোনো ধারণা ছিল না।

৪। সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চ বিস্তীর্ণ সমভূমিকে কী বলে?

(ক) পর্বত (খ) সমভূমি (গ) মালভূমি (ঘ) পাহাড়

৫। মালভূমি সৃষ্টির প্রধান কারণ কী ?

i. ভূ-আন্দোলন ii. ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন iii. লাভা সঞ্চয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৫ পাহাড় ও পর্বত (Hill and Mountain)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাহাড় বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন এবং
- পর্বতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পাহাড়

পাহাড় হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপ, যা পর্বত অপেক্ষা ছোট। পাহাড়ের উচ্চতা সাধারণত ১০০-৬০০ মিটার পর্যন্ত হয়। যেমন- ময়মনসিংহের গাড়ো পাহাড়।

পর্বত (Mountain)

ভূ-পৃষ্ঠের অতি উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢাল বিশিষ্ট শিলাস্তুপকে পর্বত বলে। পর্বত সাধারণত ৬০০ মিটারের বেশি উচ্চতা সম্পন্ন হয়। তবে পর্বতের উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কোনো কোনো পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। যেমন- পূর্ব আফ্রিকার কিলিমানজারো। আবার কিছু পর্বত ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে। এ ধরনের পর্বত সাধারণত ঢেউয়ের ন্যায় ভাঁজ বিশিষ্ট। যেমন- হিমালয় পর্বত। পর্বত গঠনের প্রক্রিয়াকে ওরোজেনেসিস (Orogenesis) বলে। গ্রীক শব্দ Oro অর্থ পর্বত এবং Genesis অর্থ সৃষ্টি হওয়া। পৃথিবীর প্রতিটি পর্বত দেখতে বাহ্যিকভাবে স্বতন্ত্র হলেও উৎপত্তিগত ও গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে এদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্বতকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. ভঙ্গিল পর্বত
খ. আগ্নেয় পর্বত
গ. চ্যুতি-স্তূপ পর্বত এবং
ঘ. উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত।

ক. ভঙ্গিল পর্বত (Folded Mountain) : পাললিক শিলাস্তর আনুভূমিক আলোড়ন বা মহাদেশীয় পর্বতের সংকোচনের ফলে কুঞ্চিত হয়ে ঢেউয়ের আকারে যে পর্বত সৃষ্টি হয় তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে (চিত্র ৩.৫.১)। চার ধরনের পর্বতের মধ্যে ভঙ্গিল পর্বত সর্বাধিক বিস্তৃত। অভিসারী প্লেট সীমানায় সংকোচনজনিত চাপে এ ধরনের পর্বত গঠিত হয় বলে এর শিলা কাঠামো ভাঁজ ও চ্যুতিযুক্ত। ভঙ্গিল পর্বত সাধারণত পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত।

বিভিন্ন পর্যায়ে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি : ভূ-বিজ্ঞানীগণ ভঙ্গিল পর্বত গঠনে কয়েকটি পর্যায় দেখিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে সমুদ্রখাতের উভয় দিক থেকে সংকোচনের ফলে নিম্নাংশ অবনমিত হয় বা নিচে নেমে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমুদ্রখাতের অবনমিত অংশে পলি জমা হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে পলির ভারে নিচের দিকে নেমে যায়। ফলে ভূ-অধঃভাঁজের সৃষ্টি হয়। তৃতীয় পর্যায়ে অবনমিত খাতের তলদেশ রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় এবং আগ্নেয়শিলা পলির ভিতরে প্রবেশ করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সংকোচন হ্রাস পায় এবং সম্পূর্ণ খাত উপরে উত্থিত হয়ে পর্বতমালা গঠন করে। যেমন-এশিয়ার হিমালয়, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, উত্তর আমেরিকার রকি এবং ইউরোপের আল্পস পর্বতমালা।

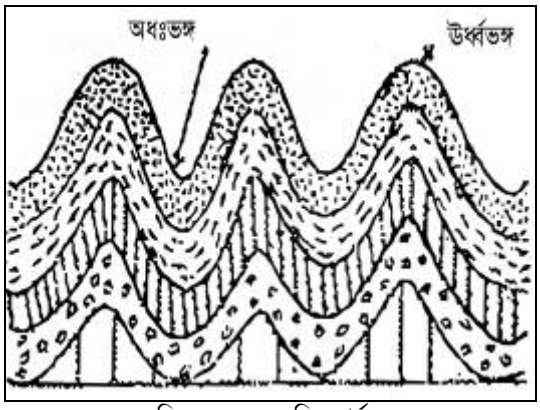

চিত্র ৩.৫.১ : ভঙ্গিল পর্বত

খ. আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountain) : ভূ-অভ্যন্তরস্থ ক্রিয়াকলাপের জন্য ম্যাগমা লাভা হিসাবে উদগিরিত হয়ে চারদিকে সঞ্চিত হয়। পরবর্তীতে জমে ঠান্ডা হয়ে যে শিলাস্তূপের সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয় পর্বত বলে (চিত্র ৩.৫.২)। লাভার প্রকৃতির ওপর আগ্নেয় পর্বতের বিস্তৃতি ও আকৃতি নির্ভর করে। কোনো কোনো আগ্নেয় পর্বত খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং স্বল্প স্থান জুড়ে থাকে। আবার স্বল্প ঢাল সম্পন্ন কিন্তু বিস্তৃত এলাকা জুড়েও এ পর্বত হতে পারে।

আগ্নেয় পর্বতের উৎপত্তি : কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূ-আলোড়নের জন্য ভূ-ত্বকের দুর্বল অংশের ফাটলের মধ্য দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ উত্তপ্ত লাভা, নানা প্রকার গ্যাস ও বাষ্প, ছাই, ধাতু ইত্যাদি প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে। এই উত্তপ্ত লাভা ফাটলের চতুর্দিকে সঞ্চিত হতে হতে উঁচু পর্বতের সৃষ্টি করে। যেমন- জাপানের ফুজিয়ামা, হাওয়াই দ্বীপের মওনালোয়া, ইতালির ভিসুভিয়াস, আফ্রিকার কিলিমানজারো ইত্যাদি।

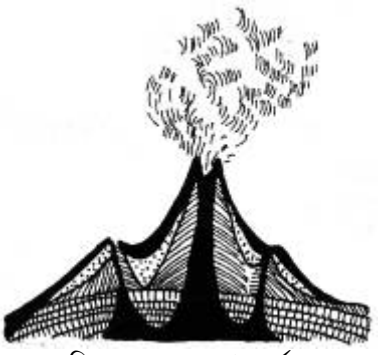
চিত্র ৩.৫.২ : আগ্নেয় পর্বত

গ. চ্যুতি-স্তূপ পর্বত (Fault-block Mountain) : ভূ-আলোড়নের ফলে শিলাস্তরের সংকোচন ও প্রসারণে ভূ-ত্বক অনেক সময় খাড়াভাবে ফেঁটে যায়। যে রেখা বরাবর ফাঁটল সৃষ্টি হয় তাকে চ্যুতি রেখা বলে। দুটি ফাঁটলের মাঝের অংশ অনেক সময় উপরে ওঠে যায় বা নিচে বসে যায়। চ্যুতি বরাবর এই ধরনের পর্বতকে চ্যুতি-স্তূপ পর্বত বলে (চিত্র ৩.৫.৩)।

চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের উৎপত্তি : তিন ধরনের পরিস্থিতিতে চ্যুতি-স্তূপ পর্বত সৃষ্টি হতে পারে।

প্রথমত : ভূ-ত্বকের শিলাস্তরে টানজনিত চাপের কারণে ফাঁটলের সৃষ্টি হয়। এ ফাঁটল বরাবর একটি শিলাস্তর পাশের স্তরের চেয়ে ওপরের দিকে উঠে গেলে বা নিচের দিকে নেমে গেলে অথবা পাশে সরে গিয়ে চ্যুতি স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা, নিউ মেক্সিকো, ক্যালিফোর্নিয়ায় এ ধরনের স্তূপ পর্বত দেখা যায়।

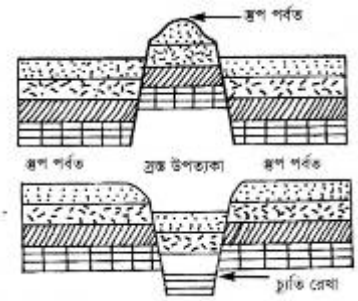

চিত্র ৩.৫.৩ : চ্যুতি-স্তূপ পর্বত

দ্বিতীয়ত : ভূ-ত্বকের কোনো অংশ ভূ-অভ্যন্তরস্থ কারণে ওপরের দিকে উঠতে থাকলে পাশ্ববর্তী শিলায় যে টানের সৃষ্টি হয়। এর ফলে ফাঁটল দেখা যায়। এই ফাঁটল বরাবর দু'পাশের শিলাস্তর নিচের দিকে নেমে যায় এবং মাঝের ঊর্ধ্বগামী শিলাস্তূপকে চ্যুতি স্তূপ পর্বতের মত দেখায়। যেমন- পূর্ব আফ্রিকার স্রস্ত উপত্যকার পাশ্ববর্তী উঁচু পার্বত্য স্তূপই এ ধরনের চ্যুতি-স্তূপ পর্বত।

তৃতীয়ত : কোনো কারণে ভূ-ত্বকের এক অংশ খাড়াভাবে পাশের সমভূমির ওপরে উঠে গেলে চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ- জার্মানির ব্লাক ফরেস্ট, ফ্রান্সের ভোঁজ এবং ভারতের বিন্ধ্যা ও ত্রিপুরা পর্বতদ্বয় চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চিত্র ৩.৫.৪ : উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত

ঘ) উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত (Residual Mountain) : ভূ-পৃষ্ঠের নরম শিলাসমূহ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত ও অপসারিত হলে কঠিন শিলাসমূহ উঁচু হয়ে পর্বতের ন্যায় অবস্থান করে। একে উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত বলে (চিত্র ৩.৫.৪)। মূলত ভূ-আলোড়নের কারণে সুদূর অতীতকালে ভূ-অভ্যন্তরস্থ ম্যাগমা উত্থিত হওয়ায় শিলাস্তর ওপরের দিকে উঠে যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাঁড়া চ্যুতি বরাবর শিলাস্তূপ ঊর্ধ্বগামী হয়। পরবর্তীতে এ সমস্ত উচ্চভূমির উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিচের আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা উন্মুক্ত হয়। পার্শ্ববর্তী ভূমির চেয়ে এ সুউচ্চ ভূমিরূপকে উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত বলে। যেমন-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্লাক হিলস্, কলোরাডোর ফ্রান্ট রেঞ্জ (কলোরাডো)।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সারসংক্ষেপ

পাহাড় হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপ, যা পর্বত অপেক্ষা ছোট। পাহাড়ের উচ্চতা সাধারণত ১০০-৬০০ মিটার পর্যন্ত হয়। আর ভূ-পৃষ্ঠের অতি উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢাল বিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। পর্বত সাধারণত ৬০০ মিটারের বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট হয়। তবে এই উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। হিমালয় পর্বত, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, ইউরোপের আল্পস, ইউরাল, ককেশাস, জাপানের ফুজিয়ামা উল্লেখযোগ্য পর্বতের উদাহরণ। উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্বতকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ভঙ্গিল পর্বত, আগ্নেয়জাত পর্বত, চ্যুতি-স্তূপ পর্বত ও উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভাঁজ বিশিষ্ট পর্বতের উদাহরণ নয় কোনটি?

(ক) কিলিমানজারো (খ) হিমালয় (গ) আল্পস (ঘ) রকি

২। উৎপত্তিগত ও গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে পর্বত কত ভাগে বিভক্ত?

(ক) ২ (খ) ৪ (গ) ৩ (ঘ) ৫

৩। কীসের প্রকৃতির ওপর আগ্নেয় পর্বতের বিস্তৃতি ও আকৃতি নির্ভর করে?

(ক) পাহাড়ের (খ) লাভার (গ) শিলার (ঘ) সবগুলি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সাথী ও তার বন্ধুরা পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষা সফরে গেলেন। তারা সুউচ্চ পাহাড় ও পর্বত সম্পর্কে তাদের শিক্ষককে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করলেন পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে পার্থক্য কী।

৪। পাহাড়ের উচ্চতা কত ?

(ক) ১০-১০০ মিটার (খ) ১০০-৬০০ মিটার

(গ) ২০০-৫০০ মিটার (ঘ) ৬০০-১০০০ মিটার

৫। জাপানে অবস্থিত পর্বতের উদাহরণ কোনটি?

(ক) ইউরাল ও ককেশাস (খ) আন্দিজ

(গ) রকি (ঘ) ফুজিয়ামা

পাঠ-৩.৬ মরুভূমি (Desert)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মরুভূমি কী তা জানতে পারবেন এবং
- মরুভূমির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মরুভূমি

মরুভূমি বলতে বুঝায় অত্যন্ত শুষ্ক, বৃষ্টিবিরল ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালি দ্বারা আবৃত অঞ্চল। কোনো একটি বৃহৎ এলাকা যে প্রক্রিয়ায় শুষ্কতায় পরিবর্তিত হয় সে প্রক্রিয়াকে মরুকরণ বলে। মরুভূমি বসবাসের জন্য অত্যন্ত অনুপযোগী। মরুভূমির দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য খুব বেশি। দিনে তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং রাতে তাপমাত্রা অনেক কমে যায়। দিন ও রাতের তাপমাত্রার ব্যাপক তারতম্যের কারণে পাথর প্রতিদিন সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে বৃহৎ পাথর খন্ডগুলো ক্রমেই ভেঙে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে বালুকণার আকার ধারণ করে। সাহারা মরুভূমি হলো পৃথিবীর বৃহত্তর মরু এলাকা। মরুভূমির আবহাওয়া অত্যন্তড় রুক্ষ হওয়ায় এখানে স্বাভাবিক গাছপালার অস্তিত্ব নেই। কষ্ট সহিষ্ণু কিছু কাঁটা ও ঝোপ জাতীয় গাছ এখানে জন্মায়। এসব গাছের শিকড় মাটির অনেক নিচে প্রবেশ করেও পানি সংগ্রহ করতে পারে না।

মরুভূমির বৈশিষ্ট্য

১। দিনের বেলা তাপমাত্রা প্রায় ৫০° বা এর উপরে থাকে,
২। রাতের বেলা তাপমাত্রা ০° এর নিচে নেমে যায়,
৩। গাছ-পালা খুবই কম। কাঁটা ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিজ্জের উপস্থিতি বেশি,
৪। বৃষ্টিপাত অনেক কম ও অনিয়মিত,
৫। গ্রীষ্মকালে খরার প্রভাব থাকে,
৬। মাটি ও বায়ু উভয়ই শুষ্ক থাকে,
৭। মাটি থেকে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ অনেক বেশি,
৮। আর্দ্রতা অনেক কম এবং
৯। ভূমিক্ষয়ের মাত্রা অনেক বেশি।

মরুভূমির শ্রেণিবিভাগ

মরুভূমি প্রধানত চার প্রকার। যথা–

১. উষ্ণ ও শুষ্ক মরুভূমি
২. শুষ্ক প্রায় মরুভূমি
৩. উপকূলীয় মরুভূমি এবং
৪. শীতল মরুভূমি।

১. উষ্ণ ও শুষ্ক মরুভূমি : আমেরিকার চিহুয়ান, সোনোরান, মোজাভি ও গ্রেট বেসিন মূলত এই প্রকারের মরুভূমি। এসব মরুভূমি সারা বছরই খুব উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে। গ্রীষ্মকালে খুব গরম হয় এবং শীতকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এখানে গড় তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বোচ্চ ৪৩-৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কখনো সর্বনিম্ন ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ নেমে আসে। এ ধরনের মরুভূমিতে সর্বোচ্চ ২৮ সেমি বৃষ্টিপাত হয়। মাটি সাধারণত পাথুরে হয়ে থাকে। এ মরুভূমিতে গাছ-পালা খুব কম। প্রাণিকূলের মধ্যে ক্যাঙ্গারু, ইঁদুর, পোকামাকড়, সরীসৃপ জাতীয় কিছু প্রাণি দেখতে পাওয়া যায়।

২. শুষ্ক প্রায় মরুভূমি : এ ধরনের মরুভূমিতে দিনে খুব গরম হয় এবং রাতে সমান্য তাপমাত্রা হ্রাস পায়। শীতকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এখানে গড় তাপমাত্রা ২১-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তবে ৩৮ ডিগ্রির বেশি হয় না। বিকাল ও রাতে সাধারণত তাপমাত্রা থাকে ১০° সে.। এ ধরনের মরুভূমিতে বছরে গড়ে ২-৪ সেমি বৃষ্টিপাত হয়। মাটি সাধারণত পাথুরে ও বালুময় হয়ে থাকে। ভারতের রাজস্থানে এ ধরনের মরুভূমি দেখা যায়।

৩. উপকূলীয় মরুভূমি : এ মরুভূমিতে সাধারণত মাঝারি ধরনের আবহাওয়া হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ১৩-২৪° সে. শীতকালে ৫° সে. হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮° সে. আর সর্বনিম্ন -৫° সে. নেমে যায়। সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ৩৭ সেমি, সর্বনিম্ন ৫ সেমি এবং বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৫-১৩ সেমি। উদাহরণ: চিলির আতাকামা মরুভূমি।

৪. শীতল মরুভূমি : এ মরুভূমি সাধারণত মেরু অঞ্চলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় দেখা যায়। গ্রীনল্যান্ড হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ২১-২৬° সে. এবং শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকে। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫-২৬ সে.মি।

শিক্ষার্থীর কাজ	মরুভূমির আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

মরুভূমি বলতে বুঝায় অত্যন্ত শুষ্ক, বৃষ্টি বিরল ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালি দ্বারা আবৃত অঞ্চল। মরুভূমি বসবাসের জন্য অত্যন্ত অনুপযোগী। মরুভূমিতে দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি হয়। মরুভূমি মূলত চার প্রকার। যথা- উষ্ণ ও শুষ্ক মরুভূমি, শুষ্ক প্রায় মরুভূমি, উপকূলীয় মরুভূমি এবং শীতল মরুভূমি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন অঞ্চল মানুষের বসবাসের অনুপযোগী?
(ক) সমতল খ) মরুভূমি (গ) ব-দ্বীপ (ঘ) সবগুলো

২। মরুভূমি কত প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৪ (গ) ৩ (ঘ) ৫

৩। চিহ্নয়ান কোন ধরনের মরুভূমি?
ক) উষ্ণ ও শুষ্ক মরুভূমি (খ) শুষ্ক প্রায় মরুভূমি
গ) উপকূলীয় মরুভূমি (ঘ) শীতল মরুভূমি

৪। শীতল মরুভূমিতে গড়ে বৃষ্টিপাত কত?
(ক) ১৫-২৬ সে.মি. (খ) ১০-১৫ সে.মি.
(গ) ১৫-২০ সে.মি. (ঘ) ০৫-১০ সে.মি.

পাঠ-৩.৭ বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (Physiographic Characterestics of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ বিশ্বে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত যা দক্ষিণ এশিয়া নামে পরিচিত। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ২০°৩৪´ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°০১´ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মিয়ানমার, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,৭১২ কি.মি। এর মধ্যে ভারতের সাথে ৩,৭১৫ কি.মি, মিয়ানমারের সাথে ২৮১ কি. মি এবং বঙ্গোপসাগরে তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কি.মি।

বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক বিশেষত্ব হচ্ছে পূর্বে নাগা, লুসাই ও আরাকান পর্বতমালা, পশ্চিমে ভারতের উপদ্বীপীয় ভূ-খন্ড ও রাজমহল মালভূমি, উত্তরে শিলং মালভূমি ও হিমালয় পর্বতমালা। ভূ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ বঙ্গখাতের একটি বৃহৎ অংশ এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ। দেশের ২০ ভাগ পাহাড়ি এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশ পলি দ্বারা গঠিত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলীসহ অসংখ্য নদী এ বিস্তৃতি প্লাবন সমভূমি গঠন করেছে। দেশের উত্তরাংশ থেকে দক্ষিণের দিকে ক্রমেই ঢালু হওয়ায় নদীগুলো দক্ষিণের দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এ দেশের ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আর্থ-সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক শ্রেণিবিভাগ : অবস্থান, ভূমির গঠন ও ভূ-তাত্ত্বিক সময়কাল অনুসারে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধানত তিনটি বৃহৎ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় (চিত্র ৩.৭.১)। যথা-

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

২. প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং

৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি।

১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ : প্রায় ৭০ মিলিয়ন বছর পূর্বে টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ পাহাড়গুলো গঠিত হয়েছে বলে এগুলোকে টারশিয়ারি যুগের পাহাড় বলা হয়। এ পাহাড়গুলো বেলেপাথর, শ্লেট জাতীয় প্রস্তর এবং কর্দম দ্বারা গঠিত। এ পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশে অবস্থিত টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলোকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং চট্টগ্রাম জেলার অংশবিশেষে অবস্থিত পাহাড়সমূহ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা প্রায় ৬১০ মিটার। এখানকার পাহাড়গুলো পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ক্রমশ বেড়েছে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিং ডং বান্দরবান জেলায় অবস্থিত যার বর্তমান নাম বিজয়। এর উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। আবার এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তে বান্দরবান জেলার কিওক্রাডং পর্বত অবস্থিত যার উচ্চতা ১,২৩০ মিটার।

এ অঞ্চলে পাহাড়ের মাঝে মাঝে বহু সংকীর্ণ উপত্যকা দেখা যায়। এ উপত্যকা দিয়ে কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা, কাসালাং, নাফ প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এ নদীগুলো বেশ খরস্রোতা।

খ) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত ছোট-বড় পাহাড়গুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ পার্বত্য ভূমির উচ্চতা সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ মিটারের বেশি নয়। তবে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাংশের পাহাড়গুলোর উচ্চতা ২৪৪ মিটার। সিলেট জেলার পাহাড়িয়া অঞ্চল শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে ১৮৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এ অঞ্চলের উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটারের মধ্যে। এ অঞ্চলের সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক শহরের উত্তরে প্রায় ৪০ বর্গকিলোমিটার স্থান নিয়ে একটি টিলা পাহাড় রয়েছে। এটিকে বলা হয় ছাতক পাহাড়। টিলাজাতীয় পাহাড়গুলো মূলত খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো ও লুসাই পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ। এ পাহাড়ের ঢালগুলো খাড়া এবং উপরিভাগ অসমান। আবার শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমানায় ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন অংশ দেখা যায়।

২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ : ভূ-তাত্ত্বিক সময়পঞ্জি অনুযায়ী আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বে এ সোপান অঞ্চল গঠিত হয়েছে বলে ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের সুবিশাল বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই উচ্চভূমি নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের আয়তন ১৩,৪২৭ বর্গকিলোমিটার। মাটির রং লাল ও ধূসর। প্লাইস্টোসিনকালের সোপান এলাকাকে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) বরেন্দ্রভূমি, খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং গ) লালমাই পাহাড়।

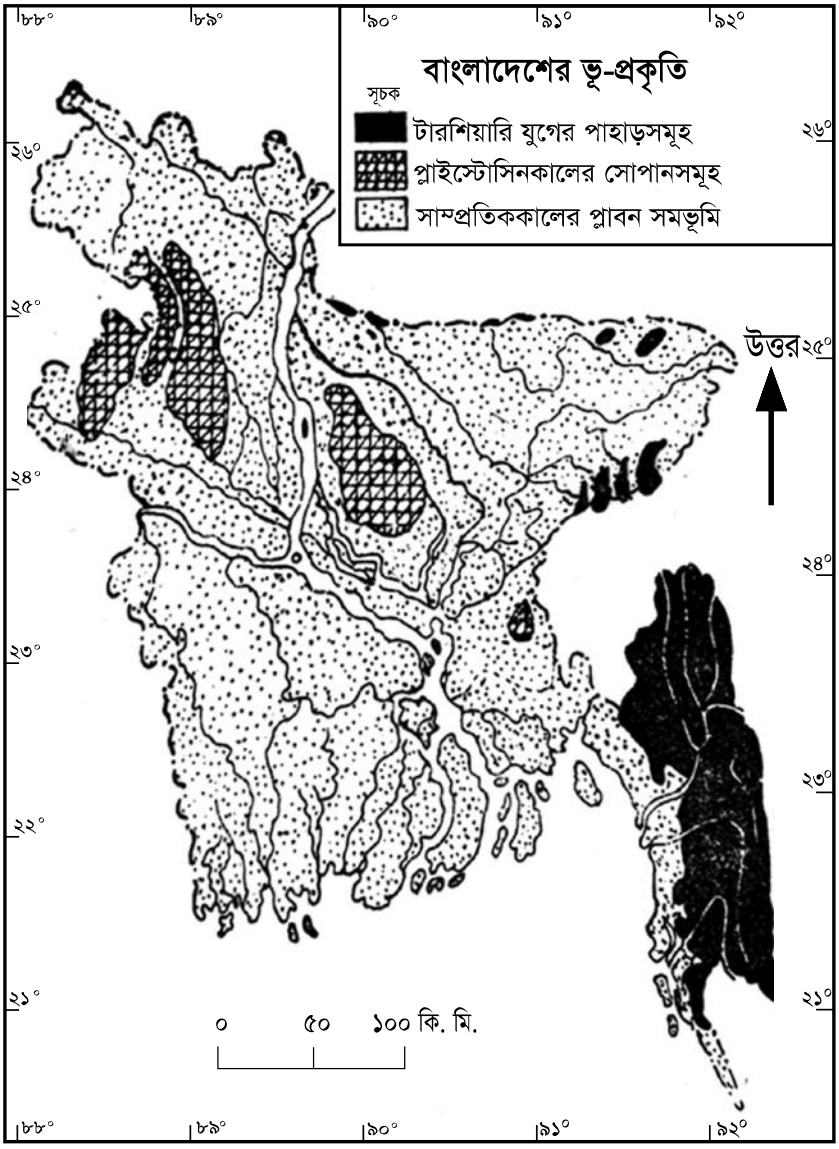

চিত্র ৩.৭.১: বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

ক) বরেন্দ্রভূমি : দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুর অঞ্চল নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। এর আয়তন ৯,২৮৮ বর্গকিলোমিটার বা ৩৬,০০ বর্গমাইল। বরেন্দ্রভূমি প্লাবন সমভূমি থেকে প্রায় ৬ থেকে ১২ মিটার উঁচু। সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলটি পুনর্ভবা, আত্রাই ও যমুনা নদী দ্বারা চারটি অংশে বিভক্ত। মাটির রং লালচে হলুদ। বরেন্দ্রভূমির ছোট বিনুনী আকৃতির নদীগুলো খাড়ি নামে পরিচিত।

খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় : ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলায় মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অবস্থিত। এ অঞ্চলের মোট আয়তন ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত এ অঞ্চলের উত্তরাংশকে বলা হয় মধুপুর

গড় এবং গাজীপুর জেলায় অবস্থিত এ অঞ্চলের দক্ষিণাংশকে বলা হয় ভাওয়ালের গড়। এ গড়ের পূর্ব ও দক্ষিণাংশের উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর দিকের উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। এই এলাকার মাটির রং সাধারণত লাল ও কঙ্করময়। মধুপুর গড়কে আবার 'নদী সোপান' বা উত্থিত ব-দ্বীপও বলা হয়। এ এলাকার মধ্য দিয়ে বংশী, শীতলক্ষ্যা, বানার, বালু, সুতিয়া, তুরাগ, লৌহজং প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়েছে।

গ) লালমাই পাহাড় : কুমিল্লা জেলা শহর থেকে ৮ কি.মি পশ্চিমে লালমাই পাহাড় অবস্থিত। এ এলাকার আয়তন ৩৪ বর্গকিলোমিটার (১৩ বর্গমাইল)। গড় উচ্চতা ২১ মিটার তবে কোনো কোনো স্থানে ৪৫ মিটার পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। লালমাই এলাকার ভূমিরূপ কোনো পর্বতশ্রেণির অংশ নয়। এটি চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ হর্স্ট (Horst) শ্রেণিভুক্ত। এ অঞ্চলের মাটির রং লাল। পাহাড়গুলো লাল মাটি, নুড়ি, বালি ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।

৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি : টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি এলাকা এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চলটি পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও এদের উপনদী, শাখানদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলের মোট আয়তন ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের বৃহত্তম এ এলাকার নদীগুলো প্রায়ই গতি পরিবর্তনের কারণে নতুন নতুন পললভূমি গঠিত হতে দেখা যায়। এ সমভূমির গড় উচ্চতা প্রায় ৯ মিটার। প্লাবন সমভূমি পলি দ্বারা গঠিত বলে এ অঞ্চলের মাটির উর্বরতা তুলনামূলকভাবে অন্য এলাকার চেয়ে অনেক বেশি। এ এলাকাতে বিচ্ছিন্নভাবে বিল-ঝিল, হাওড়-বাঁওড় ছড়িয়ে রয়েছে যা দেশের ভূ-প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশের সমগ্র সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চলটি একই ধরনের নয় বলে একে আবার নিম্নলিখিত কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।

ক) কুমিল্লার বা ত্রিপুরার সমভূমি : কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ নিয়ে এ সমভূমি অঞ্চল গঠিত। এর আয়তন ৭,৪৩৩ বর্গকিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা ৬ মিটার। বর্ষার সময় এ এলাকা প্লাবিত হয়। এ অঞ্চলে বেশকিছু নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলো হলো- সালদা, বুড়ি, গোমতি, ডাকাতিয়া প্রভৃতি।

খ) পাদদেশীয় পলল সমভূমি : দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বৃহত্তম রংপুর, দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থান জুড়ে এ পাদদেশীয় পলল সমভূমি অঞ্চল বিস্তৃত। এই সমভূমির উচ্চতা ৩০.৫ মিটার। সর্বোচ্চ উচ্চতা ৯৩.৫ মিটার। পাদদেশীয় পলল সমভূমির মোট আয়তন ৪০০০ বর্গ কি.মি.। তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া প্রভৃতি নদীবাহিত পলি জমা হয়ে পাদদেশীয় পলল সমভূমি অঞ্চলে ঢালু ভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

গ) সিলেট অববাহিকা : বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বদিকের সামান্য কিছু অংশ নিয়ে সিলেট অববাহিকা অঞ্চল গঠিত। এই এলাকার দক্ষিণাঞ্চলের হ্রদগুলোকে হাওড় বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এ অববাহিকার উচ্চতা প্রায় ৩ মিটার। বর্ষার সময় এ এলাকাটি পানিতে প্লাবিত হয়। হাকালুকি দেশের বৃহত্তম হাওড়।

ঘ) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার প্লাবন সমভূমি : বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের অংশ বিশেষ নিয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত। এই অঞ্চলেও বেশ কিছু বিল ও হাওড় আছে। বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল 'চলনবিল' এই এলাকাতে অবস্থিত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই বর্ষার সময় পানিতে প্লাবিত হয়।

ঙ) ব-দ্বীপ : বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সমভূমিকে ব-দ্বীপ বলা হয়। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলটি বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালীর সমস্ত অংশ এবং রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। সক্রিয় ব-দ্বীপ : মেঘনা হতে পশ্চিমে গড়াই-মধুমতি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সমভূমির পূর্বাংশকে সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চল বলে।

২। মৃত প্রায় ব-দ্বীপ : গড়াই-মধুমতি নদীর পশ্চিমাংশকে মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ বলা হয়। এটি বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিস্তৃত।

৩। স্রোতজ সমভূমি : বাংলাদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণাংশ জোয়ার ভাঁটা দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে এ অঞ্চলকে স্রোতজ সমভূমি বলে।

চ) চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী সমভূমি : এ সমভূমি অঞ্চলটি ফেনী নদী হতে কক্সবাজারের কিছু দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সমভূমি এলাকাটি গড়ে প্রায় ৯.৬ কিলোমিটার প্রশস্ত। এ অঞ্চলটি কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, বাঁশখালী প্রভৃতি নদীবাহিত পলল দ্বারা গঠিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তিনদিকের মূলভাগ ভারত ও মিয়ানমার দ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য ভূমি এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু পাহাড়ি এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশ সাম্প্রতিককালের নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত। যা এদেশের কৃষি খাতকে সমৃদ্ধ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত?
(ক) পশ্চিমবঙ্গ (খ) ত্রিপুরা (গ) মিয়ানমার (ঘ) বঙ্গোপসাগর

২। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) এক (খ) দুই (গ) তিন (ঘ) চার

৩। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৭১২ কি.মি. (খ) ৭১৬ কি.মি. (গ) ৭২০ কি.মি. (ঘ) ৭২৫ কি.মি.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

রহিম তাঁর বন্ধুদের নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াতে গেলেন। তাঁরা দেখলেন অনেক উঁচু-নিচু পাহাড়, বিস্তৃত সমভূমি। পাহাড়ি অঞ্চলের সৌন্দর্য অবলোকন করলেন এবং দেশের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পেলেন।

৪। লালমাই পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) কুমিল্লা (খ) নোয়াখালী (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) সিলেট

৫। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা কত?
(ক) ৬১০ মিটার (খ) ৭১০ মিটার (গ) ৮১০ মিটার (ঘ) ৯১০ মিটার।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কীসের?
খ. পৃথিবীর ভূমিরূপগুলোর নাম উল্লেখ করুন।
গ. পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
ঘ. ভঙ্গিল পর্বত ও আগ্নেয় পর্বত সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের ভূমিরূপ দৃশ্যমান। এই ভূমিরূপগুলো উৎপত্তি ও গঠন ভিন্ন ভিন্ন। তাপ, চাপ, পানিসহ বিভিন্ন প্রকার শক্তি ভূমিরূপের ভিন্নতার জন্য দায়ী। এই সব নিয়ামক প্রকৃতিকে চলমানও রাখে।

ক. সমভূমি কাকে বলে?
খ. সঞ্চয়জাত সমভূমিগুলো আলোচনা করুন।
গ. মালভূমি কাকে বলে? মালভূমির প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
ঘ. পৃথিবীর ভূমিরূপ সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশ। ধারণ ক্ষমতার অধিক জনশক্তি নিয়েও এ দেশ বরাবরই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র এর উর্বর ভূমি ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে।

ক. ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
খ. বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিগুলোর নাম লিখুন।
গ. বাংলাদেশের টারশিয়ারি যুগের পাহাড় ও প্লাইস্টোসিনকালের সোপান সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর।
ঘ. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন প্রকার ভূ-প্রকৃতি দেখান।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ :	১. খ	২. ক	৩. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ :	১. ক	২. গ	৩. খ	৪.ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ :	১. খ	২. ক	৩. ক	৪. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ :	১. গ	২. ক	৩. ক	৪. গ	৫.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ :	১. ক	২. খ	৩. খ	৪. খ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ :	১. খ	২. খ	৩. ক	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ :	১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ক	৫. ক

পাঠ-৩.৮ ব্যবহারিক : সমোন্নিত রেখার সাহায্যে বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন
(Practical : Representation of Different Landforms by using Contour Lines)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সমোন্নিত রেখার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন,
- সমোন্নিত রেখার সুবিধা-অসুবিধা বলতে পারবেন এবং
- সমোন্নিত রেখার সাহায্যে বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন করতে পারবেন।

সমোন্নতি রেখা

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমান উচ্চতাবিশিষ্ট স্থানগুলোকে মানচিত্রের ওপর যে রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয় সে রেখাকে সমোন্নতি রেখা বা সমান উচ্চতা বিশিষ্ট রেখা বলে। আর যে মানচিত্রে ভূমিরূপের প্রকৃতি সমোন্নতি রেখার সাহায্যে দেখানো হয়, তাকে সমোন্নতি রেখা মানচিত্র বলে। যেমন- কোনো পাহাড়, মালভূমি বা দ্বীপের মানচিত্র বিভিন্ন উচ্চতার উপর দিয়ে অঙ্কিত সমোন্নতি রেখা দ্বারা উচ্চতা দেখানো হয়। এছাড়া সমোন্নতি রেখা রাস্তাঘাট, জলাধার, বসতি নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার রূপায়নে সাহায্য করে থাকে।

সুবিধা

১. সমোন্নতি রেখার সাহায্যে কোনো স্থানের কোন দিক ঢালু তা বুঝতে পারা যায়।
২. দুটি স্থানের উচ্চতা ও দূরত্বের পরিমাণ জানা থাকলে প্রকৃত ঢাল নির্ণয় করা যায়।
৩. ঘন সন্নিবেশিত সমোন্নতি রেখা খাড়া ঢাল এবং হালকা সন্নিবেশিত সমোন্নতি রেখা স্বাভাবিক ঢাল নির্দেশ করে।
৪. এ পদ্ধতির মাধ্যমে আপেক্ষিক ঢাল এবং ঢালের প্রকৃতি পরিমাপ করা যায়।
৫. সমোন্নতি রেখাগুলো সহজে অঙ্কন করা যায় এবং এগুলো মানচিত্রের অন্যান্য বর্ণনা বা তথ্য প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে না।
৬. স্বল্প কল্পনাশক্তি এবং অভ্যাসের মাধ্যমে সমোন্নতি রেখা দ্বারা যে কোনো দেশের ভূ-প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব।

অসুবিধা

১. এ পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যে, সমোন্নতি রেখার ব্যবধানের চেয়ে কম উচ্চতা বিশিষ্ট স্থান সমোন্নতি রেখা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।
২. প্রকৃত জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা নিরূপণ করা হয় বলে সমোন্নতি রেখার মাধ্যমে ভূমির বন্ধুরতা নির্দেশ অত্যন্ত ধীর, মন্থর ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি।
৩. সমোন্নতি রেখা অঙ্কন করতে হলে প্রথমে বিভিন্ন স্থানের ভূমি জরিপ করে এদের উচ্চতা নির্ণয় করতে হয়।
৪. স্কেলের মধ্যে অনুপাত ঠিক না থাকলে উচ্চতা ঠিক বুঝা যায় না।
৫. অনেক সময় সমোন্নতি রেখাগুলো এত গায়ে গায়ে আঁকা থাকে যে, এদের উচ্চতার পরিমাপ লিখে রাখা সম্ভব হয় না।

সমোন্নতি রেখা থেকে ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শন

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের ভূ-প্রকৃতিকে সমতল কাগজের উপর দেখানো যতটা সহজ কিন্তু ভূ-অভ্যন্তর বা স্থলভাগের ভূ-প্রকৃতি ততটা সহজে সমতল কাগজের ওপর দেখানো যায় না। ভূ-প্রকৃতিকে বিশেষ কোনো কৌশল ও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখানো মানচিত্রকে বন্ধুরতা মানচিত্র (Relief Map) বা প্রাকৃতিক মানচিত্র (Physical Map) বলে।

সমরেখা অঙ্কন পদ্ধতি

মানচিত্রে উচ্চতা, গভীরতা বা ভূমির বন্ধুরতা দেখানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো হলো-

ক. চিত্র দ্বারা প্রকাশিত পদ্ধতি
খ. গাণিতিক পদ্ধতি এবং
গ. বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ক।

ক. চিত্র দ্বারা প্রকাশিত পদ্ধতি : চিত্র দ্বারা প্রকাশিত পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত পাঁচটি পদ্ধতিতে অঙ্কন করা যায়।

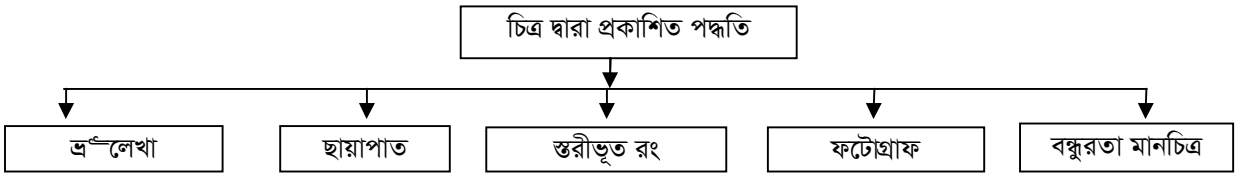

১। ভ্রংলেখা পদ্ধতি (Hachures) : ভ্রংলেখা হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরু রেখার সমষ্টি। এ রেখাগুলোকে পাহাড় বা পর্বতের ঢালের দিকে উপর থেকে নিচে টেনে সে স্থানের প্রকৃত বন্ধুরতা দেখানো হয়।

২। ছায়াপথ (Shading) : আলো ও ছায়াপাতের সাহায্যে যখন ভূ-ভাগের বন্ধুরতা নির্দেশ করা হয় তখন তাকে ছায়াপাত পদ্ধতি বলে। কোনো উঁচুভূমির একটি অংশ বেশি কালো ও অপর অংশ একটু বেশি সাদা রাখলে এর উচ্চতা সহজে বুঝা যায়। সমতল বন্ধুরতা বুঝানোর জন্য পাহাড়ের গাত্রদেশ খাড়া অংশে কালো রেখা অঙ্কন করা হয়। আবার মালভূমি, উপত্যকা তল, পাহাড়ের সমতল প্রভৃতি অংশ বুঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন হালকা বা গাঢ় রেখা অংকন করা হয়। মানচিত্রে ব্যবহৃত ছায়াপাতের একটি সূচক উল্লেখ করা হয়।

৩। স্তরীভূত রং পদ্ধতি (Layer Tint Method): কোনো স্থানের বন্ধুরতা দেখানোর জন্য যখন মানচিত্রে নানা প্রকার রঙ ব্যবহার করা হয় তখন তাকে স্তরীভূত রং পদ্ধতি বলে। এক্ষেত্রে একেকটি রং একেকটি উচ্চতা নির্দেশ করে। সাধারণত নিম্নভূমি দেখানোর জন্য সবুজ, অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি দেখানোর জন্য হলুদ এবং অধিক উচ্চতা দেখানোর জন্য খয়েরি রং ব্যবহার করা হয়।

৪। ফটোগ্রাফ পদ্ধতি (Photograph Method) : এরোপ্লেন থেকে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আলোকচিত্র তুলে প্রদর্শন করাকে ফটোগ্রাফ পদ্ধতি বলে।

৫। বন্ধুরতা মানচিত্র ও মডেল পদ্ধতি (Relief Map and Model Method): কাদামাটি, পুটিং, প্লাস্টার, কাগজের মন্ড প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের যে বন্ধুরতা মানচিত্রে দেখানো হয় তাকে বন্ধুরতা মানচিত্র ও মডেল বলে।

খ. গাণিতিক পদ্ধতি : গাণিতিকভাবেও নিম্নোক্ত পাঁচটি পদ্ধতিতে সমরেখা অঙ্কন করা যায়।

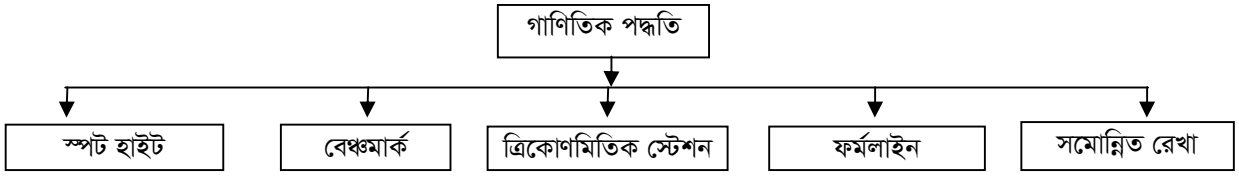

১। স্পট হাইট (Spot Height) : কোনো স্থানের প্রকৃত উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে জরিপ করে নির্দেশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে মানচিত্রের উপর বিন্দু ও এর পাশে সংখ্যা দ্বারা সমতল থেকে কোনো স্থানের উচ্চতা ফুট বা মিটারে প্রকাশ করা হয়। এ উচ্চতাগুলো লক্ষ্য করে কোনো স্থান কত উঁচুতে তা সহজে বুঝতে পারা যায়।

২। বেঞ্চ মার্ক (Bench Mark) : কোনো অট্টালিকা বা ইট, পাথর, সিমেন্ট প্রভৃতি দ্বারা তৈরি জমাটবদ্ধ স্তম্ভের গায়ে সমুদ্র সমতল থেকে ঐ স্থানের উচ্চতা লেখা হলে তাকে বেঞ্চ মার্ক বলে। জরিপের মাধ্যমে বা ব্যারোমিটারের সাহায্যে এরূপ উচ্চতা নির্ণয় করা হয়। মানচিত্রে এগুলো **B.M** দ্বারা চিহ্নিত করে এর পাশে সে স্থানের উচ্চতা ফুট বা মিটারে লেখা হয়।

৩। ত্রিকোণমিতিক ষ্টেশন (Trigonometrical Station) : এটি ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত বিভিন্ন বিন্দু যা ত্রিভুজীকরণ পদ্ধতির জরিপের ষ্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মানচিত্রের উপর এদেরকে ক্ষুদ্র নিরেট (Solid) ত্রিভুজ দ্বারা চিত্রিত করে তার পাশে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা লিখতে হয়।

৪। সমোন্নতি রেখা (Contour Line) : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমান উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানগুলোকে মানচিত্রের উপর যে আঁকাবাঁকা রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয় সে রেখাকে সমোন্নতি রেখা বা সমোচ্চ রেখা বলে। মানচিত্রে এরূপ সমোন্নতি রেখার সাহায্যে কোনো স্থানের বন্ধুরতা দেখানো হয়।

৫। ফর্ম লাইন (Form Lines) : যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপিত সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যস্থলে যেসব স্থানে যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চতা নিরূপণ করা সম্ভব হয়না সেখানে উচ্চতা কত হতে পারে তা আনুমানিকভাবে নিরূপণ করে ভাঙ্গা রেখা দ্বারা ঐরূপ সমোন্নতি বিশিষ্ট স্থানগুলো যোগ করলে তাকে ফর্ম লাইন বলা হয়।

গ. বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় (Combination of Several Methods) : আধুনিক প্রাকৃতিক মানচিত্রের অধিকাংশেই বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে বন্ধুরতা দেখানো হয়। যেমন- যখন সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যস্থিত ব্যবধান খুব বেশি হয় তখন অপ্রধান ভূমিরূপ দেখানোর জন্য ভ্রূলেখার সাহায্য নেওয়া হয়। অথবা অনেক সময় সমোন্নতি রেখা ও ভ্রূলেখা দ্বারা অঙ্কিত মানচিত্রে স্থানীয় উচ্চতা সংযোগ করে মানচিত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।

সমোন্নতি রেখার সাহায্যে কতিপয় ভূমিরূপ প্রদর্শন

ভূমিরূপের বন্ধুরতা প্রদর্শন করার জন্য উত্তম পদ্ধতি হলো সমোন্নতি রেখা। সমোন্নতি রেখা দ্বারা ভূমিরূপের চিত্র মোটামুটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা যায়। সমোন্নতি রেখার আকার ও আকৃতির ওপর নির্ভর করে ভূমির প্রকৃত বন্ধুরতা। যেমন- কোনো স্থানের সমোন্নতি রেখাগুলো যদি ঘন হয় তাহলে সে স্থানের ভূমিরূপ হবে খাড়া বা অধিক ঢালযুক্ত। পক্ষান্তরে, রেখাগুলো যদি অপেক্ষাকৃত দূরে দূরে অবস্থিত হয় তাহলে বুঝতে হবে সেখানকার ভূমিরূপ কম ঢালযুক্ত। নিম্নে সমোন্নতি রেখার সাহায্যে ভূমিরূপ ও তার পার্শ্বচিত্র দেখানো হলো-

১. কোণাকৃতির পাহাড় (Conical Hill) : ভূমি চতুর্দিক থেকে প্রায় সমান হারে উঁচু হয়ে যে পাহাড়ের সৃষ্টি করে তার আকৃতি শাঙ্কব এর মতো বা কোণাকৃতির হয়। তাই এ পাহাড়কে কোণাকৃতির পাহাড় বা শাঙ্কব আকৃতির পাহাড় বলে (চিত্র ৩.৮.১)। শাঙ্কব আকৃতি বা কোণাকৃতির পাহাড়ের সমোন্নতি রেখাগুলো সাধারণত প্রায় বৃত্তাকার হয়। এদের উচ্চতা বৃত্তের বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় সবচেয়ে বেশি হয়।

২. দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড় (Double Peak Hill) : বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বেশ কয়েকটি সমোন্নতি রেখা বৃত্তাকারে অবস্থিত হলে এবং তারপর এর দুই অংশে পৃথকভাবে বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট কয়েকটি বৃত্তাকার সমোন্নতি রেখা অঙ্কিত হলে ঐ এলাকায় বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চলকে দুটি শৃঙ্গের মতো দেখায়। এ জাতীয় পাহাড়ের দুটি শৃঙ্গ থাকায় একে দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড় বলে (চিত্র ৩.৮.২)। দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড়কে আবার ম্যাসিক বলা হয়।

৩. মালভূমি (Plateau) : বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে যে উঁচু সমতল ভূমি বিদ্যমান থাকে তাকে মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৮.৩)। এর পার্শ্বদেশ খুব খাড়া ঢালবিশিষ্ট। সমোন্নতি রেখাগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকে। এ ঢাল বেয়ে বিভিন্ন নদী বয়ে যেতে পারে। এসব নদী দ্বারা মালভূমি ব্যবচ্ছেদিত হয়।

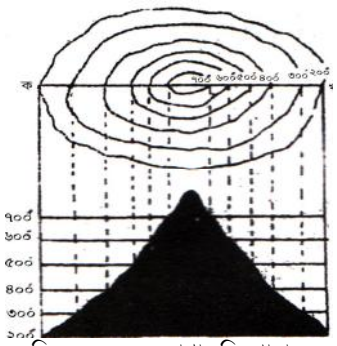

চিত্র ৩.৮.১ : কোণাকৃতি পাহাড়

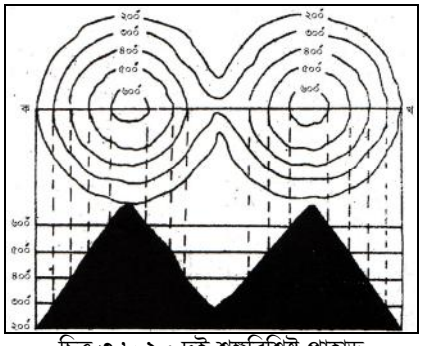

চিত্র ৩.৮.২ : দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড়

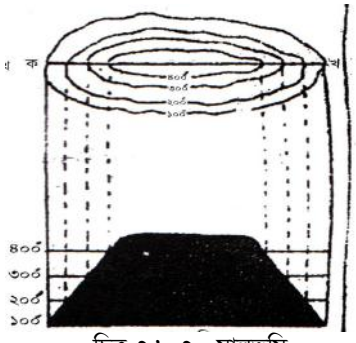

চিত্র ৩.৮.৩ : মালভূমি

৪. আগ্নেয়গিরি (Volcano) : ভূ-পৃষ্ঠের কোনো দুর্বল অংশ বা ফাটল দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত গলিত পদার্থ নির্গত হয়ে তা সঞ্চিত হলে যে পাহাড়ের সৃষ্টি হয় তাকে আগ্নেয়গিরি বলে (চিত্র ৩.৮.৪)। আগ্নেয়গিরির কেন্দ্রস্থলে একটি গহ্বর বা মুখ থাকে, এ মুখকে জ্বালামুখ বলে।

৫. 'ভি' আকৃতির উপত্যকা (V. Shaped Valley) : কোনো উপত্যকার পাশের দিকের ঢাল অধিক খাড়া ও নিচের ভূ-ভাগ সংকীর্ণ হলে যে উপত্যকার সৃষ্টি হয় তা ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো দেখায়। এজন্য একে 'V' আকৃতির উপত্যকা বলে (চিত্র ৩.৮.৫)। এতে ঢাল সাধারণত উত্তল হয়। যে স্থানে সমোন্নতি রেখার মান কম সেখানে ঐ রেখাগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট ও উপত্যকার গায়ে দূরে বিন্যস্ত হয়।

৬. 'ইউ' আকৃতির উপত্যকা (U. Shaped Valley) : হিমবাহ প্রবাহিত অঞ্চলে U- আকৃতির উপত্যকা দেখা যায়। মানচিত্রে এটি চওড়া উপত্যকার উভয় পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট সমোন্নতি রেখার সাহায্যে দেখানো হয়। V-আকৃতির উপক্যতার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও সমোন্নতি রেখার মান ভিতর থেকে বর্হিদেশে ক্রমশ অধিক। হিমবাহ অঞ্চলে কোন ছোট উপত্যকা প্রধান উপত্যকার মধ্যে পতিত হলে তাকে ঝুলন্ত উপত্যকা বলে। এ ক্ষেত্রে U-আকৃতির সমোন্নতি রেখার ডান বা বাম বা উভয় পাশের বহির্দেশের সমোন্নতি রেখাগুলো অনেকটা গোলাকৃতি হয়ে ঝুলন্ত উপত্যকার অবস্থান নির্দেশ করে (চিত্র: ৩.৮.৬)।

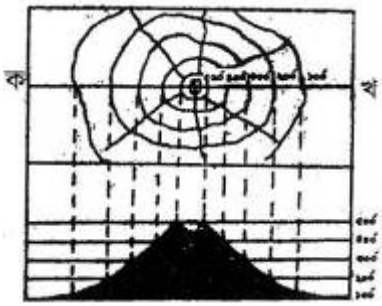

চিত্র ৩.৮.৪ : আগ্নেয়গিরি

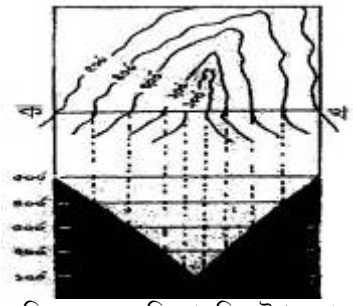

চিত্র ৩.৮.৫ : ভি আকৃতির উপত্যকা

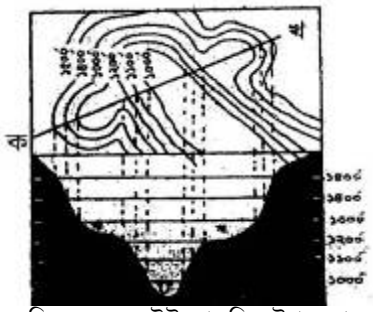

চিত্র ৩.৮.৬ : ইউ আকৃতির উপত্যকা

৭. সুষম ঢাল (Uniform Slope) : যে ঢাল খাড়াভাবে নেমে যায় তাকে সুষম বা সমান ঢাল বলে। সুষম ঢালের সমোন্নতি রেখাগুলো সাধারণত সমান দূরে দূরে অবস্থান করে (চিত্র ৩.৮.৭)।

৮. উত্তল ঢাল (Convex Slop) : ভূমিরূপের মধ্যভাগ উঁচু ও দুই পাশ নিচু হলে সমোন্নতি রেখার মাধ্যমে যে ঢাল সৃষ্টি হয় তাকে উত্তল ঢাল বলে (চিত্র ৩.৮.৮)। উত্তল ঢালের সমোন্নতি রেখাগুলো সাধারণত ঘন হয় এবং উপরের দিকে একটি থেকে অপরটি দূরে দূরে অবস্থান করে।

৯. অবতল ঢাল (Concave Slope) : যখন কোনো ভূ-ভাগে উঁচু থেকে নিচের দিকে নামার সময় ঢালটি আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে বেঁকে যায় তখন যে ঢালের সৃষ্টি হয় তা অবতল ঢাল (চিত্র ৩.৮.৯)। এ ঢালের সমোন্নতি রেখাগুলো উপরের দিকে ঘন ও নিচের দিকে ক্রমশ দূরে সরে যায়।

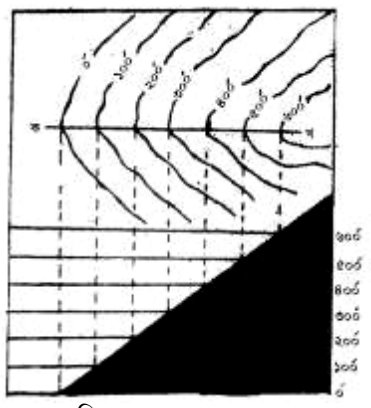
চিত্র ৩.৮.৭ : সুষম ঢাল

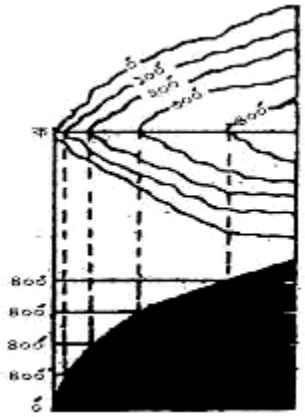
চিত্র ৩.৮.৮ : উত্তল ঢাল

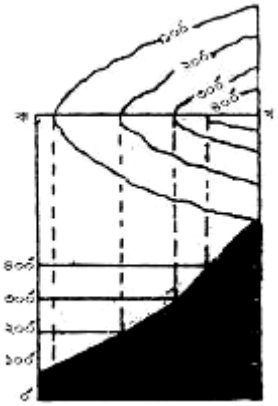
চিত্র ৩.৮.৯ : অবতল ঢাল

১০. জলপ্রপাত (Waterfall) : নদী উপত্যকায় পাশাপাশি কঠিন ও নরম শিলা থাকলে নরম শিলা অতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও কঠিন শিলা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এই ধরনের ঢালের জন্য জলপ্রপাত তৈরি হয় (চিত্র ৩.৮.১০)।

১১. গিরিখাত (Gorge): পার্বত্য অঞ্চলে যদি উত্তল ঢাল খুব খাড়া হয়ে পাহাড়ে প্রবেশ করে তাহলে গিরিখাতের সৃষ্টি হয়। এরূপ গিরিখাতের সমোন্নতি রেখাগুলো খুব ঘন ঘন সন্নিবেশিত হয়ে অগ্রসর হয়া অনেক সময় গিরিখাতের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় (চিত্র: ৩.৮.১১)।

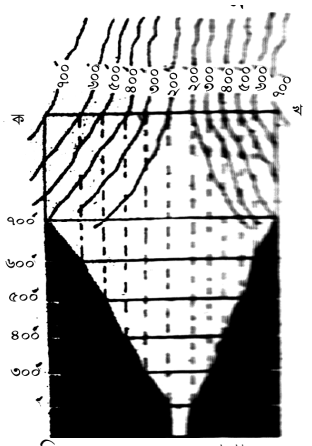

চিত্র ৩.৮.১০ : জলপ্রপাত

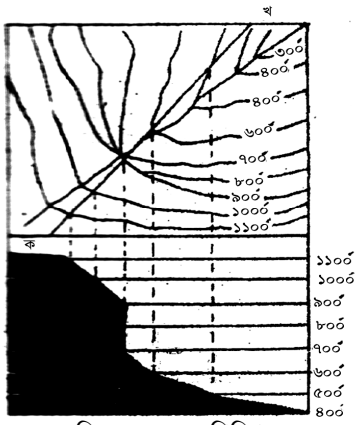

চিত্র ৩.৮.১১ : গিরিখাত

১২. শৈলশিরা (Ridge) : দূরে দূরে বিন্যস্ত সমোন্নতি রেখার মধ্যে যদি কোথাও ঘন ঘন দুই একটি সমোন্নতি রেখা থাকে তবে তা একটি উচ্চভূমির নির্দেশ করে। এরূপ উচ্চভূমিকে শৈলশিরা বলে (চিত্র ৩.৮.১২)।

১৩. নল বা ক্ষুদ্র টিলা (Knoll) : পাহাড় ও টিলা অপেক্ষা নিচু ইতস্তত বিচ্ছিন্ন নাতি উঁচু ঢিবি জাতীয় সাধারণত গোলাকৃতি স্বতন্ত্র উচ্চভূমিকে নল বা গোলাকার ক্ষুদ্র টিলা বলে। সমভূমি অঞ্চলে প্রায়ই শিলারাশি সঞ্চিত হয়ে ক্ষুদ্র টিলা আকৃতির নলের সৃষ্টি হয় (চিত্র ৩.৮.১৩)।

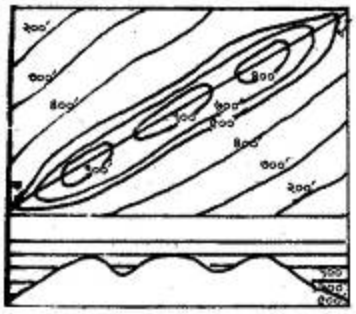
চিত্র ৩.৮.১২ : শৈলশিলা

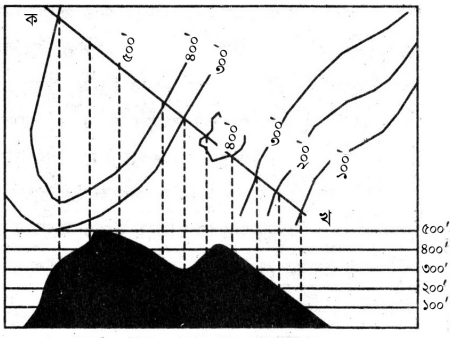

চিত্র ৩.৮.১৩ : নল বা ক্ষুদ্র টিলা

শিক্ষার্থীর কাজ	কোণাকৃতির পাহাড়, দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড়,মালভূমি, গিরিখাত, জলপ্রপাত ভূমিরূপসমূহের সমোন্নতি রেখা ও তার পার্শ্বচিত্র অঙ্কন করুন।